KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কল ২৬
Collection : KLMLGK	Publisher দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়
Title অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 7 8 9 10	Year of Publication : Jan 1996 May 1996 Sep 1996 Jan 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor দ্বিজেন দেবনাথ	Remarks

C.D. Rol No KLMLGK

শারদীয়

অনুরাগ

১৪০৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। সর্বাধ্যক্ষ ঃ শান্তি রায়,
পৃষ্ঠপোষক ঃ দীপালী চৌধুরী, কমলপাণি রায়চৌধুরী, অপরেশ সেন

অনুরাগ

নবম সংকলন ঃ আশ্বিন ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য
সহযোগী ঃ জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী
সাংগঠনিক প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

নবম সংকলন : আশ্বিন ১৪০৩
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

রাগানুগ। অর্থই পরমার্থ ৩
সর্বাধ্যক্ষের কলম। শান্তি রায় ৫
কুশীনগরে। দীপালী চৌধুরী ৬
সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস। জয়ন্তী সান্যাল ১১
শান্তি। সুধা চট্টোপাধ্যায় ১৭
সিস্টার রোজী। পুষ্পা সাকসেনা, ধীরা ভট্টাচার্য ২০
লগ্ন। বীথিকা চন্দ্র ২৮
আলোর অমাবস্যা। ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬
শিক্ষক। দীপককুমার গুপ্ত ৪১
নাগরী। মোহনা সঙ্গীন। নির্মলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫২
শেষ রাত্রির লগ্ন। মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ৫৩
পুজোর আওয়াজ। গ্রাম। বিয়েবাড়ি। ঊর্মী সেনগুপ্ত ৫৪
মহিয়সী রাক্ষসী। হরি ভট্ট ৫৫
মিলন। দেবকুমার গুহ ৫৮
সুন্দরের আলেয়ায়। সুপ্রীতি ঘোষাল ৫৮
তোমার আমার। সনৎকুমার মিত্র ৫৯
ভাগ্যিস তুমি ছিলে তাই। মৃণাল ঘোষ ৫৯
সমাচার : এক। দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০
নীল আকাশের নীচে। বিমলেন্দু দাস ৬০
কালের ইতিহাস। শান্তনু খাটুয়া ৬১
প্রেম। প্রশান্ত কুমার পাল ৬২
মতামত। জগন্নাথ মিত্র, নগেন নিয়োগী ৬৩

সত্য প্রেস, ২০২এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা

অর্থই পরমার্থ

এই বছর মে-জুন দু মাস আমরা পার্লামেন্টের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করলাম তা খুবই হতাশ করেছে। আমরা শিখে এসেছি যে একজনের কথা শেষ হলে অন্য জন কথা বলবে। সেখানে দেখলাম এর অত্যন্ত মর্মান্তিক বিপরীত চিত্র। আমাদের তা নিতান্ত ব্যথিত করেছে।

জাতপাত নিয়ে কাজিয়ারও শেষ নেই যেন। এই সব আলোচনায় মানুষের পরিবেশক শতধা ছন্ন ভিন্ন করে কি লাভ ? এভাবে মানুষকে পদে পদে অপমানিত না করে তাদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সহায়তা যতদূর সম্ভব করতে পারলেই দেশের চেহেরা পালটাতে পারে।

গান্ধীজী একসময় বলেছিলেন,—দেশের লোকের আয় যেন নিচে একশত টাকা এবং উপরে পাঁচশত টাকা হয়। এর কম-বেশী হলে অর্থনীতির সমতা নষ্ট হবে। আমাদের দেশে একাধিক চরিত্রের সরকার এসেছেন, কিন্তু কেউ এদিকে নজর দিতে পারেন নি। পারলে ৩০ কোটি, ১৩৩ কোটির কেলেঙ্কারী ঠেকানো যেত।

গরীব মানুষকে সাহায্য করাই আধুনিক প্রগতিশীল দুনিয়ার প্রত্যেক সরকারের চেষ্টা। সেক্ষেত্রে মাথাপিছু মাসিক যার ৩০০ টাকার কম রোজগার এবং পরিবার পিছু যাদের আয় হাজার টাকার কম, ধরা যাক, এ রকম একটা কর্মসূচী নিয়ে অনায়াসে সারা ভারতময় কাজ শুরু করা যেতে পারে। তাহলে অযথা কোটি কোটি টাকা খরচ করে অনর্থক ঝগড়া-বিবাদের মহড়া দিতে হয় না।

কে বসে উপাসনা করে, কে হাঁটু গেঁড়ে উপাসনা করে, কে চোখ বুজে উপাসনা করে, কে আদৌ হয়তো এসব বিশ্বাসই করে না তাই কারকি সম্প্রদায় তা নিয়েও এত চুলচেরা বিবাদ করা অপ্রয়োজনীয়। মানুষটি মুচি কি পুরুত না ফুটপাতের হকার তা

দিয়ে তো কিছু যায় আসে না! দেখার দরকার সে সমাজের আর্থিক কোন স্তরে রয়েছে এবং তাকে কিভাবে সত্যিকারের সহায়তা করা যায়। আরো দেখতে হবে, মানবিকতা যেন ব্যাহত না হয়।

'অনুরাগ' আগাগোড়াই বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। বাংলাভাষার কোন প্রকারে অসম্মানে সে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারে না।

প্রয়াত উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক সম্পর্কে আমাদের সশ্রদ্ধ সংযোজন ঃ

উদিতেন্দু প্রকাশ মল্লিক বলেছেন ঃ আমার জন্ম আসামের তেজপুরে ১৯০৫ সালের ২২শে জুলাই, ৬ শ্রাবণ ১৩১২ সনের এক বর্ষা মুখর সাঁঝ বেলায়। ওঁর মেয়ে রেণু (সুমিতা মল্লিক)-র পত্রে জানলাম, গত ১৯৯৬ সালের ২৪শে এপ্রিল, ১৪০৩ সনের ১১ই চৈত্র, নিজবাটী নিরালায় ৬৭, অশোক পার্ক টালীগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪৭ ঠিকানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

উদিতেন্দু বাবুর পিতা, রায় বাহাদুর অরবিন্দপ্রকাশ মল্লিক ছিলেন আসামের সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। আট ভাই বোনের মধ্যে উদিতেন্দু ছিলেন পিতা মাতার তৃতীয় পুত্র। ভাল গান গাইতে পারতেন। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং অঙ্কে অত্যন্ত উচ্চ নম্বর সংগ্রহ করে সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে "ইউনিফায়েড থিওরী অব ইউনিভার্স" সম্বন্ধে বই প্রকাশ করেন। এবং রুশীয় বিজ্ঞান ইন্স্টিটিউট থেকে সুসমালোচিত রিপোর্টটি 'মস্কো' থেকে প্রকাশ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কলকাতার কন্সালটিং ইঞ্জিনীয়ার্স "হোপ জনস্টন কোম্পানির মালিক ছিলেন। ইনি 'অনুরাগে'র সভাপতি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, এক মেয়ে, দুই নাতনী বর্তমান। এঁদের সমবেদনা জানাবার ভাষা আজ আর আমাদের নেই। তাই বলছি মঙ্গলময় সকলের মঙ্গল করুন।

সর্বাধ্যক্ষের কলম শ্রীমতী শান্তি রায়

আমাদের প্রিয় ও সুন্দর 'অনুরাগ' সাহিত্য অধিবেশনে বেশ কিছুদিন যাবৎ যোগ দিতে পারছি না। যদিও আমি ওখানে যেতে পারি না তবু সর্বদা খোঁজখবর নেই।

ধীরে ধীরে হলেও 'অনুরাগ' তার লক্ষ্যের দিকে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। আমি আশা রাখি আমার সতীর্থ বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রণয় গোস্বামী, ধীরা ভট্টাচার্য, ঋতা ব্যাণার্জী, সুধা চ্যাটার্জী, ও অন্যান্য সভ্যদের অনলস চেষ্টা ও উৎসাহে অনুরাগ তার লক্ষ্য ধ্রুবতারার কাছে ঠিকই একদিন পেঁাছে যাবে।

আমার মনে হয়, যাদের বিদেশে আত্মীয়-বন্ধু আছেন তাদের কাছে যদি 'অনুরাগ'-এর আদর্শটা একটু পেঁাছে দিতে পারা যায় তবে বাংলা ভাষার প্রচার চারদিকে আরো ছড়িয়ে পড়বে ও অনেকে উপকৃতও হবেন। আমরা এখনো দেশবিদেশে বাংলাভাষা প্রচার করতে না পারলে ধীরে ধীরে বাংলাভাষার প্রচলন বাঙ্গালীদের ভিতরেও কমে আসবে। তবে আশার কথা, ইদানীং কিছু কিছু প্রবাসী বাঙ্গালী বাংলাভাষার দিকে কিছুটা নজর দিচ্ছেন। আমাদের দেখতে হবে চেষ্টা করতে হবে বিদেশে বেশি সংখ্যায় সভ্য বাড়াবার জন্য। প্রবাসী সভ্যরা যাতে নিয়মিত 'অনুরাগ' পায় তাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

আজকাল দেখা যায়, বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ইংরেজির পাশে পাশে হিন্দি ভাষা খুব ব্যবহার করে। সেটার দিকে যদি বড়রা একটু দৃষ্টি দেন ও তাদের ইংরেজি ও হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাটাও শেখার ও বলার দিকে বিশেষ করে জোর দেন তবে বাংলাভাষার এত দুর্দশায় পড়তে হবে না।

অনুরাগের কামনা, কোথাও যেন বাংলাভাষার অনাদর না হয়। 'অনুরাগ' বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। সে তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব পালনে ব্রতী।—এই কথা বলে আমি আবার অনুরাগের শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করে সকলকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা জানিয়ে এখানেই কলম রাখছি।

কুশীনগরে দীপালী চৌধুরী

২৮.১০.৯৫

আজ আমরা গোরক্ষপুরে হোটেল সিদ্ধার্থে বেলা সাড়ে নটার মধ্যে স্নান, খাওয়া সেরে তৈরী হয়ে নিলাম পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থ কুশীনগর দর্শন অভিলাষে। ভারতবর্ষের অধুনা ইউ-পি রাজ্যের কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় চলে আসেন; এবং এখানেই তাঁর মহাপরিনির্বাণ অর্থাৎ দেহত্যাগ ঘটে। এখন কুশীনগর একটি অতি সাধারণ ও শান্ত জনপদ, যা কি না একটা ছিল মল্লরাজাদের আমলে ঝলমলে এক সমৃদ্ধশালী নগরী। ইতিহাসের কথা মানেই যেন বেদনায় ভরা এক স্মৃতি-কথা।

আমাদের সিদ্ধার্থ হোটেলের ভদ্র ম্যানেজার আমাদের বার জনের দলের জন্য একখানা নতুন বিশাল বড় ট্রেকারের ব্যবস্থা করেছেন কুশীনগরে যাওয়া ও আসার জন্য। আমাদের ট্রেকার গাড়ি এবার ছুটে চলেছে কুশীনগরের দিকে। গোরক্ষপুর শহর থেকে কুশীনগরের দূরত্ব মাত্র ৫৫ কিঃ মিঃ। ঘন্টা দেড়েকের পথ গাড়িতে। গোরক্ষপুর থেকে বাসেও যাওয়া যায় কুশী-নগরে। গোরক্ষপুরের রাস্তা চওড়া, পিচঢালা, পরিচ্ছন্ন। রাস্তার ধারে হোটেল, দোকান, বাড়ীঘর, মানুষজন ইত্যাদির অভাব নেই। গোরক্ষপুর বেশ বড় শহর। বড় হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, কাছারী সবই এই শহরে আছে। এখানে নাথ সম্প্রদায়ের গোরক্ষনাথের মন্দির সব চাইতে বিখ্যাত এবং সত্যি দর্শনীয় স্থান। সব মিলিয়ে গোরক্ষপুরের স্নিগ্ধ, সুন্দর আবহাওয়া খুব ভাল লাগে। পৌনে দুঘন্টায় আমরা কুশীনগরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলাম।

কুশীনগরও বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানের মত বিশাল বড় জায়গা জুড়ে ফুলবাগানে ঘেরা একটি পার্ক। প্রবেশ

পথে এসে মনে হল কোন বড় সুদৃশ্য উদ্যানে প্রবেশ করছি আমরা। সামনেই লাল রঙের একতলা বাড়ী এবং কয়েকজ গেরুয়াধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম। পথের দুই ধারে লাল, হলুদ কলাবতী ফুলের বাগানকে রেখে চলতে, চলতে সামনেই হঠাৎ দেখতে পেলাম সাদা রঙের অদ্ভুত লম্বাটে ধরণের একটি বৌদ্ধ চৈত্য। চৈত্যটির গড়ন অসাধারণ। মনে হবে একখানা ধবধবে সাদা কাগজের বড় খণ্ডকে লম্বা করে ভাজ করে ফুলিয়ে গোল করে রাখা আছে সবুজ বাগানের মাঝে। চৈত্যটির গোল দুই প্রান্তে দুটি জানালা। সামনে অনেকগুলি লম্বা সিঁড়ি ভেঙে লম্বা টানা, পরিচ্ছন্ন বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে বেশ উঁচু চওড়া দরজা দিয়ে চৈত্যের ভিতর প্রবেশ করতে হয়। চৈত্যের অভ্যন্তরে পাথরের লম্বা বেদীর ওপর তেইশ ফুট লম্বা শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি সোনালী রঙের অপরূপ সুন্দর পাষাণমূর্ত্তি। ডানপাশ ঘিরে শুয়ে আছেন বুদ্ধদেব চির নিদ্রায় নিদ্রিত; মাথার নীচে ডান হাত রেখে। মাথার একপাশে পাথরের তৈরী ঝুলি রাখা আছে। বাঁ হাতটি সরলভাবে দেহের ওপর প্রসারিত। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সরল জীবন যাপনের প্রতীক যেন এই বাঁ হাতের সরল প্রসারণ। বেদী সামনের দিকে নীচে রয়েছে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও আরো একজন শিষ্যের ও দুজন শিষ্যার ক্রন্দন রত, শোকে বিহ্বল খোঁদাই মূর্ত্তি। এতো জীবন্ত মূর্ত্তি কোন্ শিল্পীর সৃষ্টি জানতে পারলাম না।

চিরনিদ্রায় শায়িত বুদ্ধদেবের দেহের গড়ন ও সুখের ভাব অনিন্দ্য সুন্দর। সামনাসামনি তাকালে মনে হয় বুদ্ধের মুখে পরম প্রশান্তি বিরাজমান আর পাশ থেকে তাকালে মনে হয় বুদ্ধের মুখে যেন বিষণ্ণতার ছায়া। এই অজানা শিল্পীকেও শত শত প্রণাম জানাই তাঁর অপরূপ শিল্পকীর্ত্তির জন্য। সত্যি এমন জীবন্ত পাষাণ মূর্ত্তি আমার চোখে এর আগে পড়ে নি। মৃত্যুর যে এতো সুন্দর, এতো শোভনরূপ হতে পারে তা বুদ্ধদেবের

এই মহাপরিনির্বাণের মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষভাবে দর্শনে অনুভব করলাম। ঐ বৌদ্ধ চৈত্যটির নাম হল নির্বাণ মন্দির।' এই মন্দির, যেখানে বুদ্ধদেব অসুস্থ অবস্থায় এসেছিলেন "মাথাকান-ওয়ার" যার নাম, "রামভর" স্তূপ যেখানে বুদ্ধদেবকে দাহ করা হয়েছিল, আরো অন্ততপক্ষে দশটি মনাষ্টারী স্তূপ, বৌদ্ধ মন্দির মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। আর শায়িত বিশাল বড় বুদ্ধ মূর্ত্তিটি মাটির তলা থেকে ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ভগ্ন নির্বাণ মন্দির ও শায়িত বুদ্ধদেবকে বার্মার বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সারিয়ে নিয়ে নতুন করে স্থাপন করেছেন ১৯৫৬ সালে।

ঐতিহাসিকদের মতে অনিন্দ্যসুন্দর শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তিটি নির্বান মন্দিরে প্রথম স্থাপন করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হরিবোলা পঞ্চম শতাব্দীতে। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীর মত এই কুশীনগরও তার এতো বড় সমৃদ্ধ ইতিহাস সমেত মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকে বহু বছর ধরে। বৃটিশ শাসনকালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবার এই সমৃদ্ধ বৌদ্ধ জনপদ কুশীনগর, যা নাকি একদা ছিল মল্লরাজাদের ঝলমলে রাজধানী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানুষকে তার ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস আবার নতুন করে শোনাচ্ছে।

নির্বাণ মন্দিরের পেছনে আধ কিঃ মিঃ হাঁটা পথে আমরা হাঁটতে হাঁটতে পেঁাছে গেলাম "মাথাকানওয়ারে" যেখানে বুদ্ধদেব বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় কয়েকটি দিন অবস্থান করেছিলেন। মাথাকানওয়ারে এখন আছে এক মজা পুকুরে একটু চিক্ চিকে জল। পুকুরের পাড়ে রয়েছে ছোট্ট পাকা শেঁওলা ধরা ঘর। পুকুরের জলে এবং শেওলা ধরা ঘরে এখন রয়েছে কয়েকটি অর্দ্ধ ভগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তি। মাথা কানওয়ারের নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, বিষণ্ন

পরিবেশে দাঁড়িয়ে আমার মন চলে গেছে সেই সুদূর আড়াই বছর আগে যখন বুদ্ধদেব আশিবছর বয়সে বৃদ্ধ এবং অসুস্থ অবস্থায় গভীর শাল বনে ঢাকা মাথাকানওয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বছরে আটমাস ঘুরে, ঘুরে বেড়াতেন দেশ হতে দেশান্তরে পিঠে ঝোলা বেঁধে। বর্ষার চারমাস কোন বনে কুটিরে বাস করতেন। বুদ্ধদেব জীবনের শেষ বর্ষাটি কাটিয়েছিলেন বৈশালীর বেলুরে। তারপর কুশীনগরের উদ্দেশ্যে বেরোলেন তিনি। পথে পাবার আম্রবনে রইলেন কটা দিন। সেখানে ভক্ত চুন্দ কর্মকার তাঁকে আদর করে খেতে দিলেন শুয়োরের মাংস। বুদ্ধদেব অত্যন্ত কম খেতেন। এই সামান্য গরু ভোজনেই তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লো। তিনি পাবার আম্রবন থেকে ধীরে ধীরে হিরণ্যবতী নদী পার হয়ে কুশীনগরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে সব সময় ছিলেন বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ। কুশীনগরে পেঁাছে লালবনের ভিতর দুটি শালগাছের মাঝখানে বুদ্ধদেবের অন্তিম শয্যা বিছিয়ে দিলেন আনন্দ চোখের জল ফেলতে ফেলতে। বুদ্ধদেব উত্তর দিকে মাথা রেখে শুলেন যেমন-তেমন ভাবে নয়—সিংহ-শয্যায়। অন্তিম শয্যায় শুয়ে ধ্যান করতে করতে লীন হয়ে গেলেন অর্থাৎ দেহ-ত্যাগ করলেন বুদ্ধদেব।

মাথাকানওয়ার থেকে ১·৫ কিঃমিঃ পূর্বে রয়েছে বুদ্ধদেবের সমাধিস্থল, "রামভর" স্তূপ। অর্থাৎ বুদ্ধদেবকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানটি। আমরা কুশীনগরের সদর রাস্তা ধরে দ্রুত পা চালিয়েছি "রামভর" স্তূপের উদ্দেশ্যে। এখন সূর্যাস্ত প্রায় হয় হয়। লাল আবীর রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের পাশ দিয়ে হুস, হুস করে বাস, খড় ভর্ত্তি গরুর গাড়ি, মানুষ জন সবই চলেছে। অবশেষে আমরা পেঁাছে গেলাম বুদ্ধদেবের পরম পবিত্র সমাধিস্থল "রামভর" স্তূপের সামনে

স্তূপটি বিশাল উঁচু এবং ব্যাসেও বিরাট বড়। এক কথায় প্রকাণ্ড এই রামভর স্তূপটি। ছোট, ছোট ইঁট দিয়ে তৈরী। ইঁটের ফাঁকে, ফাঁকে সবুজ তৃণেরা মাথা দোলাচ্ছে। মাটির তলায় অনেকদিন ছিল বলে ইঁটের ওপরের আস্তরণ এখন আর নেই। স্তূপের চার পাশ জনমানবহীন, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ ঘন জঙ্গলে ঘেরা এক কালের যুবতী হীরণ্যবতী নদী এখন শীর্ণকায়া মজা খালের রূপ নিয়ে জঙ্গলের ভিতর নিঃশব্দে, সস্নেহে ঘিরে রেখেছে পবিত্র "রামভর" স্তূপকে। স্তূপটি এখন ভারত সরকারের আরকিয়োলজি বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। রামভর স্তূপকে দূরে ঘিরে রেখেছে যেমন সবুজ, গভীর জঙ্গল ও হীরণ্যবতী নদী আবার কাছে ঘিরে আছে সজীব ফুলেরা তাদের বিচিত্র সুন্দর গন্ধ নিয়ে। আমিএই পবিত্র স্তূপের পাদদেশকে মাথা ঠেকিয়ে বার বার প্রণাম করলাম। আর স্তূপটির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগলো গৌতম বুদ্ধের জর জীবনের অবসান হয়েছে আজ বহু, বহু বছর আগে।

কিন্তু বুদ্ধদেবের অমরবাণী এখনও হিংসা লোভ ও হানা-হানিতে মত্ত পৃথিবীকে অহিংসার আলো দেখাচ্ছে। বুদ্ধদেবের প্রেমের অহিংসার ও মৈত্রীর বাণী পৃথিবীর সব মানুষকে মুক্তির ও পরম সত্যের পথ অতীতেও দেখিয়েছে, এখনও দেখাচ্ছে এবং চিরদিনই দেখাবে। কারণ সত্যের যে মৃত্যু নেই। সত্যের ধারক বাহক বলে বুদ্ধদেবও অমর। সত্যি, কুশীনগরে আজ আলো আঁধারির এই গোধূলিক্ষণে বুদ্ধদেবের পবিত্র সমাধিস্থল, "রামভর" স্তূপের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের অহিংসা ও মৈত্রীর অমর বাণী আমার শুদ্ধ আত্মার মাঝে অনুরণিত হতে লাগলো অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। তারপর অভ্যস্ত, সাধারণ জীবনে ফিরে গিয়ে আমার মন কোথায় যাবে, কোনখানে কে জানে ?

সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস জয়ন্তী সান্যাল

সুভাষ প্রণীত 'ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম' (১৯৪২) ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও-ইংরেজ সরকার বইটি ভারতে প্রবেশ করতে দেয়নি। ডেইলি হেরাল্ড লিখেছিল,—লেখক শান্ত, যুক্তিপূর্ণ ও ধীরচিত্তে বইটি লিখেছেন। সুভাষের বইটি ঠিক আত্মচরিত নয়, কিন্তু তাঁর নিজের কথা অনিবার্য ভাবেই এখানে এসেছে, কারণ যে-স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী তিনি শোনাচ্ছেন, তার অন্যতম সৈনিক তিনি।

সুভাষের সঙ্গে গান্ধীজির সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন ছিল না—তাই মহাত্মার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশে তিনি অনেক বেশি কুণ্ঠাহীন, অনেক বেশী আপসহীন। উপরোক্ত বইতে কঠোরতম সমালোচনা রয়েছে গান্ধীজির—কিন্তু গান্ধীর অনুগামীরা স্বীকার করবেন-যে সমালোচনায় যুক্তি আছে, এবং হীন মনোভাবের লেশমাত্র নেই।

গান্ধীজির উপদেশে কংগ্রেস ডিসেম্বর মাসে লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হল না।

সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব আনলেন, শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করেকংগ্রেসের একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করা উচিত। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বামপন্থী সুভাষের এই প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্রের পূর্ণস্বরাজের দাবি অগ্রাহ্য হলেও কলকাতা কংগ্রেসে ৯৭৩টি ভোট এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছিল।

অনেক গান্ধীবাদী দেশনায়ক-সুভাষচন্দ্রকে সর্বভারতীয়

কংগ্রেসের সঙ্গে নিত্যকলহপ্রবণ চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেন। দেশবন্ধুর অনুগামী সুভাষ ছিলেন খাঁটি রক্ত—উত্তর কালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে সুভাষচন্দ্র এক ও অদ্বিতীয়। বাংলাদেশ মহাত্মা গান্ধীকে মাথায় করে রাখলেও, প্রতিটি বাঙালীর বুকে সুভাষ বাসা বেঁধেছেন।

১৯৩৩ সালে সুভাষকে ইয়োরোপে চিকিৎসার ছলে, ব্রিটিশ সরকার নির্বাসিত করে রাখে। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে ও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করার জন্য গান্ধীজিকে অনুরোধ জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্ল রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু C. F. Andrews। গান্ধীজি বোবা হয়ে রইলেন।

লাহোর কংগ্রেসে জহরলাল সভাপতি হলেন (১৯৩৩) তবু সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে গান্ধীজির সংঘর্ষ এড়ানো যায়নি। ত্রিপুরী সম্মেলনের প্রসঙ্গে গান্ধীজি পরে বলেছেন "আমি প্রথমাবধি সুভাষের পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। তার কারণটা বলব না।" তাঁর সুভাষ-বিরোধিতার কারণটা পরবর্তীকালে জানা গেছে। কে এম মুন্সীর হাত দিয়ে ভারত সরকার সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত তাদের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট গান্ধীজির কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিত। মুন্সীজি নিজেই তা জানিয়ে দিয়েছেন। ব্রিটিশের ও মহাত্মার শিবির একই সঙ্গে অস্বস্তির সঙ্গে দেখল, ভারতের রাষ্ট্রগগণে একখণ্ড মেঘের সঞ্চার। ক্রমে সুভাষ ও সুভাষবাদ বিকল্প নেতৃত্বের দীর্ঘ ছায়া দিয়ে উভয়কে শঙ্কিত করেছে। ত্রিপুরী নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও সুভাষচন্দ্র পদত্যাগে বাধ্য হলেন—তারিখটা ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯। ৪০-এ সুভাষবাবু বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন। নেহেরু স্বীকার করেছিলেন, বাস্তবিকই তিনি সুভাষের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন। (I let Subhas

down)। সুভাষ ও নেহেরুর মধ্যে গান্ধীজি বোধ হয় বড় ব্যবধান পট্টভি সীতারামিয়া। তিনি মহাত্মা বন্দিত হয়েও কংগ্রেস সভাপতি প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছিলেন, রসিকতা করে বলেছিলেন adhoc কংগ্রেস কোন শক্তি add করতে পারে নি, বরং বিয়োগের ভাগ-ই বেশী। সুভাষ অপসারণ যেন চন্দ্র থেকে সূর্য কিরণ বেরিয়ে যাওয়া।

সুভাষ নির্বাচিত হবার পরে, তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করাতে এ সময়ে বাংলার জনগণ ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন —Michael Edword (Lastyear of British rule in India) বইতে লিখেছেন—Gandhi now turned the technique of noncooperation not against the British but against Bose and Bose was forced to resign সেই কুখ্যাত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সূত্র—"To nominate the President accordance with the wishes of Gandhiji the resolution reduces the President to a non-entity অথবা গান্ধীজির রবার-ষ্ট্যাম্পে পরিণত হল।" সুভাষের নিজমতানুযায়ী কমিটিতে মেম্বার নেওরা, সাবজেক্ট কমিটি অথবা plenary সেশনে আগের কমিটির সভ্যরা যোগ দিয়ে সুভাষের মতাদর্শ প্রকাশ করতেই দিলেন না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন সভাপতির কাজ। প্যাটেল নতুন কমিটিকে বিগত কমিটির সদস্যদের উপর দোষারোপের জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে বললেন। এতো সরাসরি সুভাষকে আক্রমণ। ১৯৪১-এ দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য, সুভাষ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শশাংকশেখর সান্যালকে বলেছিলেন—অবিভক্ত বাংলার ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সহযোগে কংগ্রেসদল কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব না করে যে ভুল করেছে—তায় প্রায়শ্চিত্ত অনেক মূল্যে করতে হবে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রণক্ষেত্রে পরিণত

হবে ইত্যাদি"। এ নিদারুণ সত্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জন্য বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আধিপত্য গড়ে ওঠে।

স্বাধীন ভারতের পরিকাঠামো পরিকল্পনায়, দূরদর্শী সুভাষ তিনটি সমস্যার কথা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন.—(১) দেশের নিরাপত্তা (২) দারিদ্র্য ও শিক্ষার অগ্রগতি (৩) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্লুপ্রিণ্ট মেঘনাদ সহার সহ-যোগিতায় রচনা করে গিয়েছিলেন—তাতেই এখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলছে, এই আসামান্য দূরদর্শী মানুষের নামগন্ধ কোথাও নেই। সুভাষই National Planning কমিটির চেয়ারম্যান হতে নেহেরুকে আহ্বান করেছিলেন। এই প্রয়াত জওহরলালের হাতেই ছিল—'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্পর্কে বেশকিছু কথাই লিখেছেন এতে। সুভাষের কোন ভূমিকা ছিল, তা একটিবারও উল্লেখ করেন নি। ১৯৪২-এ 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেবার পরে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ গর্জে উঠল বার্লিন বেতার মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে। চারিদিকে সেন্সার, কংগ্রেস, সোসালিষ্ট পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লক বেআইনী ঘোষিত। এই সংকট সময়ে ভারতের জনগণের কাছে আগষ্ট অভ্যুত্থানের সংবাদ ও যোগাযোগের বাহন হল সুভাষ-চন্দ্রের তিনটি বেতার কেন্দ্র। গান্ধী পন্থার ঐতিহ্যের সঙ্গে পারম্পরিকতা রক্ষা করে সুভাষ ১২ দফা কর্মসূচী যাব নাম 'অহিংস গেরিলা যুদ্ধ নন-ভায়োলেণ্ট গেরিলা ওয়ারফেয়ার বলে যাচ্ছিলেন। পোষ্টাল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সব যোগাযোগ, পুলিশ ও সৈন্য চলাচলের বাধা দেওয়া, গোপন বুলেটিন ও গোপন রেডিওর ব্যবস্থা করা, সুভাষ বরাবর বলেছেন-গণ অভ্যুত্থানের অন্তিম লক্ষ্য হিসাবে প্রতি সরকার বা Parallel

গভর্নমেণ্ট তৈরী করা হোক্। জয়প্রকাশনারায়ণ তাঁর গোপন আস্তানা থেকে আগষ্ট বিপ্লবকে নতুনরূপ ও কর্মসূচী দিয়ে বিপ্লবের গণস্রোত মন্থর করলেও ১৯৪৩ পর্য্যন্ত সারা দেশে গরিলা সংগ্রামের কর্মধারা অব্যাহত রাখতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান।

এর মধ্যে কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা ছিল দেশদ্রোহিতার। তাই জয়প্রকাশজী তাঁর ঐতিহাসিক পত্রের একটিতে লেখেন—"যারা নিজেরাই ব্রিটিশরাজের কুইসলিঙ তাদের পক্ষে সুভাষবসুকে কুইসলিঙ্ অপবাদ দেওয়া সহজ। সুভাষের ঐকান্তিক স্বদেশ প্রেমকে যিনি সবসময়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি দেশকে বিক্রি করে দেবেন, তা কল্পনা করাও যায় না। জয়প্রকাশ সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের মুক্তি ফৌজের সর্বভাবে সহায়তা করুন। সুভাষ বলেছেন, আজাদ-হিন্দ বিপ্লব, আগষ্ট বিপ্লবের ক্রমান্বিত লয়। কংগ্রেসের বা গান্ধীবাদের ধোঁয়াটে সংগ্রাম—"minimum sacrifice for maximum number"—তাঁকে আকর্ষণ করেনি।

ভারতের মাটিতে পা দিয়ে, সুভাষ গান্ধীজির কাছে গিয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে পারেননি। দেশমাতৃকার সেবায় চাই-"ভক্তি, সর্বস্ব পণ, সর্বস্ব নিবেদন।" সর্বত্যাগী যোগী দেশবন্ধুর কাছে পেলেন মুক্তিঋণ শোধ করার প্রেরণা, মায়ের চরণে বলি প্রদত্ত জীবনবোধ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, প্রতিনিঃশ্বাসে 'বন্দেমাতরম্'। বিবেকানন্দের কাছে পেয়েছেন তাঁর মানসপুত্র দুর্বার প্রাণশক্তি, অগ্নিতেজ। রবীন্দ্রনাথের তিনি জনগণ-মন-অধিনায়ক। এ এক বিরামবিহীন ওঁকার ধ্বনি—always a new horizon. কিন্তু নেহেরু এই IN A কে 'ভ্রান্ত' কিন্তু দেশপ্রেমিক বলে অভিহিত করেছে। ভ্রান্ত হলেও তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছে, বলেছেন। তাই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন দঃ-পূর্ব এশিয়ায় লক্ষ-

লক্ষ নর-নারী। কিশোর-শিশু বুক-নিঙড়ানো রক্তধারা নিবেদন করেছিলেন। Hindu কথাটি (H-humanity, I-individuality) N-nationality, D-divinity, U-unity,—সুভাষ মর্মে-মর্মে বুঝে গিয়েছিলেন। ১৯৪৬-এ ক্রিপ্‌সমিশন ভারতে আসার সময়ে এবং এই মিশন বিফল হওয়ার সময়ে সুভাষ যে-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে স্বদেশবাসীদের সম্বোধন করে বক্তব্য রাখছিলেন গান্ধীজির প্রস্তাবে ছিল তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। সেজন্য ক্রিপস্‌ মিশনকে 'a post dated চেক' বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন গান্ধীজি। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে-মহাত্মা ও জাতির পিতা বলে সম্বোধন করে চলেছিলেন। গান্ধীজিও এ সময় সুভাষকে 'a patriot of all patriots' বলে বন্দিত করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবে ·সংগ্রামের প্রয়োজনে নেহেরু কখনো নরমপন্থী ছিলেন না। কিন্তু ফ্যাসিজমই প্রধান শত্রু—এই প্রত্যয় থেকে তাঁর সেদিনকার দ্বিধা ছিল। সুভাষচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে যে দীর্ঘপত্র ইতিহাসের দলিল রূপে রেখে গেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে নেহেরু সে সময় সুভাষকে সাহায্য দেন নি। গান্ধীজি এক সুভাষকে নিয়ে চলতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর বিমাতৃসুলভ ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর কিছু দুঃখবোধ হয়েছিল বলে তার প্রকাশ ব্যক্তিগত কথাবার্তায় ধরা পড়ত।

অর্ধশতাব্দীর উপর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা

লক্ষ্মী বস্ত্রালয়

১০০/এ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

[বসুশ্রী সিনেমার পাশে]

শান্তি সুধা চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন বাদে বাড়ীতে একটি পুত্র সন্তান জন্মাল।

মনোজ বাবুর মায়ের আর আনন্দ ধরে না। সঙ্গে সঙ্গে তার নামকরণ করে ফেললেন।

খোকামণির নাম হোক পতিতপাবন। ও পতিতদের পাপীদের উদ্ধার করবে। মনোজবাবু শুনে বললেন, ছেলে কি তার সন্ন্যাসী হবে মা? মা শুনে বললেন, ষাট, ষাট, তা কেন হতে যাবে। উদ্ধার করবার অনেক পথ আছে বাবা! কিন্তু খোকার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল।

এমন সুন্দর ছেলে হল, তার একটা সুন্দর নাম হবে। তা নয়, কি একটা সেকেলে নাম পতিতপাবন। শাশুড়ীর মুখের ওপর তো আর বলা যায় না। তাই স্বামীর কাছেই বললেন।

তিনি শুনে বললেন, এখন রেখেছেন থাক না, পরে ভাল দেখে একটা ভাল নাম রাখলেই চলবে।

কিন্তু তা আর হল না। ঐ পতিত পাবন নামটাই জয়ী হয়ে গেল খোকার। তবে ছাট কাট করে, ডাকা হতে লাগল, পতু বলে, প্রিয়পাত্রকে যে নামেই ডাকা হোক না সেটাই যেন মধুর মত শুনতে লাগে।

ক্রমে পতু বড় হতে লাগল, বাড়ির সকলের নয়নের মণি হয়ে। অতি শান্ত স্বভাবের ধীর স্থির মেধাবী। পাড়ার সবাইকারও প্রিয়। স্কুলে ভর্ত্তি হল। জীবনতো চলতে চলতেই পরিণত হয়ে ওঠে।

ক্রমে পতু স্কুলের পড়া শেষ করে, কলেজে ভর্ত্তি হল।

ঠাকুমাও স্বর্গে চলে গেলেন। পতু প্রথমটা কেমন যেন অন্য মনা হয়ে গেল। এত স্নেহ ভালবাসা হারান একটা অব্যক্ত বেদনা, তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে গেল। সময়ের প্রলেপে মানুষের সব কিছু

জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। কলেজের পড়া শেষ হতেই চাকরির চেষ্টা চলতে লাগল। ওর এক মামা, পুলিশে চাকরি করেন। তিনিই ওকে ওই লাইনে নিয়ে গেলেন। ওর মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও। পতুর মা বললেন, দাদা ছেলে কেবল চোর ডাকাত বদমায়েস গুণ্ডাদের নিয়েই জীবন কাটাবে ?

তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, অপরাধিকে তো শুধু শাস্তি দেওয়া হয় না, তাদের চরিত্র সংশোধনও করার চেষ্টা করা হয়। সৎ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলে যে কি আনন্দ সেটা তুই বুঝবিনে বোন। সেখনেই ওর পতিতপাবন নামটা সার্থক হয়ে উঠবে দেখিস। পতুর মা আর কিছু বলতে পারলেন না। অগত্যা পতুর পুলিশেই চাকরি হল। পদোন্নতি হতে হতে ও-সির পদ প্রাপ্তি হল। একটা নাম করা থানার ও সি হয়েছে পতু। বিয়ে করেছে। ওর বাবা মাও বৃদ্ধ হয়েছেন। নিজেদের বাসস্থান থাকায় সে বিষয়ে চিন্তা করতে হয় না। আর মনোজবাবু চাকরি হতে অবসর নিয়ে বেশ মোটা টাকাই পেয়েছেন। তাই অবস্থা ও সচ্ছল। শান্তির সংসার। একদিন পতিতপাবন থানায় বসে আছেন, এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রবেশি লোক, একেবারে কাঁদ কাঁদ হয়ে এসে বললেন,—বড়বাবু বাঁচান। বড়ই বিপদে পড়েছি। বলে একটা টাকা ভর্ত্তি থলি, টেবিলের উপরে রাখলেন।

পতিত পাবন ঘুষ নেওয়াটাকে দারুণ ঘৃণা করে। কিন্তু তবুও কিছু না বলে, তার কাছে জানতে চান কি হয়েছে। সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বলেন, দেখি কি করতে পারি। গুনে দেখেন দশ হাজার টাকা। সেটি আলমারিতে রেখে চাবি দিয়ে অন্য সহকর্ম্মীকে বলেন,—এই লোকটিকে ধরেলক আপে পুরুণ। খুনি আসামী। সহকর্ম্মীরা জানত ঐ প্রৌঢ় লোকটি দশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে ওসির হাতে। তবুও কেন যে বড় বাবু ওকে ধরে লক আপে পুরতে বললেন, তাদের এবং ঐ প্রৌঢ়

লোকটির বোধ গম্য হল না। ঘুষে তো সাত খুন মাপ হয়ে যায়। কিন্তু পতিতপাবন যে অন্য ধরনের। তাদের ঐ অবাক হওয়া দেখে, ও, সি, হেসে বললেন,—বুঝেছি আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছেন। ঘুষ নিয়েও ওকে ধরতে বলছি কেন ? শুনুন, আজকাল সমাজে একটা ভয়ঙ্কর কুপ্রথা চালু হয়েছে, এই ঘুষ নেওয়া।

এটা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। না হলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। দেখছেন না দেশের কি হাল হয়েছে। মানুষ কোথাও সুবিচার পাচ্ছে না, কোন কাজই হচ্ছে না ঘুষ না দিলে। এটা যেমন করেই হোক বন্ধ করতেই হবে। ঘুষ দিতে এলে নেবেন, কিন্তু কর্ত্তব্যে ফাঁকি দেবেন না। লোকে যখন বুঝবে ঘুষ দিলেও কাজ হয় না, অন্যায় করলে শাস্তি হবেই, তখন ঘুষ দেওয়া আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ আর ঘুষ দেবে না। কারণ শাসনে কোন কাজ হয় না। ও. সি.-র সততা দেখে সহকর্মীরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ভালবাসা, শত গুণ বৃদ্ধি পেল।

লক-আপের সেই প্রৌঢ় লোকটি যখন তার শাস্তির কথা শুনল, ও-সির কাছে এসে কেঁদে বলল, এটা কি হল দাদা ? আমার দশ হাজার টাকার কি হবে ? ওটা যে আমার স্ত্রীর গহনা বিক্রির টাকা। ও, সি, সব শুনে বললেন, আপনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওটা নিয়ে যাবেন। প্রৌঢ় লোকটি তবুও বলল,—শাস্তি কি আমাকে নিতেই হবে ? ক্ষমা করবেন না ? ও, সি, দৃঢ় স্বরে বললেন,—খুনীর ক্ষমা নেই ! আপনারা দল বেঁধে স্বার্থের লোভে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছেন। অন্য কারণে নয়। প্রৌঢ় লোকটি আর কিছুই বলতে পারল না। ও, সি.-র ইঙ্গিতে দ্বারোয়ান এসে লোকটিকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল।

সিস্টার রোজী ডঃ পুষ্পা সাকসেনা

অনুবাদ— ধীরা ভট্টাচার্য

বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে অনিতার করুণ স্বর ও সিস্টার রোজীর কর্কশ গলার বকুনীর আওয়াজ আমার বুকে হাতুড়ী পিটতে লাগল। বার বার মনে হচ্ছিল দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ি কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী আমার হাত শক্ত করে ধরে ছিল। হঠাৎ দরজা খুলে সিস্টার রোজী আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে চলে গেলেন আর অনিতা আমার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে বলল—মা, সিস্টার আমার লাগছে জেনেও বার বার আমার ফোঁড়াটা কাটছিল আর আমায় খুব বকেছে—আমার কষ্ট হচ্ছে মা।

অনিতার সহ্যশক্তির প্রশংসা করতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি ঐ যুবক ডাক্তারটীর ওপর রাগটা সিস্টার রোজী অনিতার ওপরই দেখিয়েছিলেন। অনিতার নাকের পাশে একটা ছোট ফোড়া হয়েছিল। সেটা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। ডাঃ মনীষ দেখেই বলেছিলেন, ছোট জিনিস অনেক সময় ভীষণ রূপ নেয়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে অনিতাকে সিস্টার রোজীর কাছে নিয়ে যেতে বলেন।

প্রৌঢ়া সিস্টার রোজী নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্য রোগীদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তারের নির্দেশ শুনেই সিস্টার রোজী প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন—"এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। ডাক্তারকে বলুন অপারেশন করতে।" ডাক্তার মনীষ সিস্টারের কথা শুনেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—এই রোজী প্রত্যেকদিন একটা না একটা ঝামেলা বাঁধাবে।

দুবার ডাকবার পর সিস্টার রোজী বিদ্রোহিনীর বেশে ডাঃ মনীষ-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন "সিস্টার প্রথমে সুঁচ দিয়ে পুজেটা বার করবার চেষ্টা করবেন।

না বেরোলে ছুরী দিয়ে সামান্য একটু চিরে দেবেন, দেখবেন কাটাটা যেন গভীর আর লম্বা না হয়।

সিস্টার রোজী যেই নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন আমার আতঙ্কিত মনের কথা ডাক্তারকে বললাম। "দেখুন ডাক্তার সিস্টার রোজী নিজের মনের রাগটা আমার বাচ্চার ওপর দেখাবেন না তো?' স্মিত হাস্যে ডাক্তার আমার শঙ্কাকে নির্ভুল বলেই মেনে নিলেন। অগত্যা আমি সিস্টারের ঘরের দিকে চললাম। চলতে চলতেই সিস্টারের বকবকানি সুরু হয়ে গেল। ওয়ার্ডের ছোট নার্সকে বললেন—"বলছেন কাটাটা না গভীর হয় না লম্বা হয়—এ কাজটা নিজে করলেই তো হয়। সব কাজ রোজী কর, রোজী ফালতু কিনা।"

এই মেয়ে এখানে বসো, এই কথা বলে সিস্টার রোজী আমাকে কর্কশ স্বরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। অনিতা যেই আমার আঁচল চেপে ধরল আমি উদ্বিগ্ন স্বরে বললাম—"সিস্টার আমাকে দয়া করে এখানে থাকতে দিন, আমি কিছু বলব না।" "না না তোমাকে এখানে একদমই থাকতে দেওয়া যাবে না", এই কথা বলে সিস্টার আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঘরের মধ্যে থেকে সিস্টার রোজীর ক্রুদ্ধস্বর বাইরে শোনা যেতে লাগল। আর কিছুই নয়, এই নতুন ডাক্তাররা শুধু শুধু সব রোগীকে এখানে পাঠিয়ে দেবে। এই খুকী চুপ করে বসো, একদম নড়বে না। রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল। বেচারা অনিতা সিস্টার রোকীর বকুনিতে আরও বেশী···। বিরক্ত হয়ে অবিতাকে নিয়ে ডাক্তারের সামনে গিয়ে রাগ আর চাপতে পারলাম না। "ডাক্তার বাবু, আপনি অনিতাকে সিস্টার রোজীর কাছে পাঠিয়েছেন এতে অনিতার কী দোষ, সিস্টার আপনার ওপর রাগটা অনিতার ওপর ঝাড়লেন। ইনি নার্স, এনার কাজ রোগীকে সেবা করা না তার মনে কষ্ট দেওয়া? এঁরা কি জন্য টাকা নেন?" রাগের চোটে আমি আরও কী কী বলেছিলাম জানি না। ডাক্তার

বাবুও উত্তেজিত হয়ে বললেন "ঠিক আছে, মিসেস কান্ত আপনি মুখ্য চিকিৎসা অধিকারীকে লিখিত অভিযোগ করুন, আমিও কথা বলব।"

সৌম্যদর্শন গম্ভীর মুখ্য চিকিৎসা অধিকারী ডাক্তার ঘোষ স্বয়ং বললেন "সিস্টার রোজীর তরফ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে উনি এত উগ্র স্বভাব নন। মনে হয় পরিস্থিতি ওনাকে উগ্র করে তুলেছে।"

যুবক ডাক্তারটি শুনেই বলে উঠলেন- "জানি না কি ব্যাপার, উনি সব সময়ই সিস্টার রোজীর পক্ষ সমর্থন করেন। কতবার সিস্টার রোজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এই জন্যই উনি এত বেড়ে গেছেন। আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, মনে হল এই জন্যই সিস্টার রোজী কখনও ক্ষমা চাননি। "এবার একটা কিছু ব্যবস্থা হবে" এই কথা বলে আমি বাড়ী চলে এলাম। শীঘ্রই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিজের নিম্নস্থ কর্মচারীর কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করলেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উচিৎ ব্যবস্থা নিতে বললেন।

তদন্ত সভা বসল। সিস্টার রোজী নিজের স্বভাবানুযায়ী উল্টোপাল্টা কথা বলে আমার অভিযোগ নস্যাৎ করে দিলেন। কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে সিস্টার রোজী তো চিৎকার শুরু করে দিলেন। কমিটির সদস্যগণ সিস্টার রোজীর ক্ষিপ্ত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ছিঁয়ে উঠলেন। এই ধরণের মহিলা এই কাজের উপযুক্ত নন। মুখ্য অধিকারীর অনুরোধে সিস্টার রোজীকে সাবধান করে দেওয়া হল, চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হল না, কিন্তু অন্য শহরে বদলী করে দেওয়া হল।

ঐ দিন সন্ধ্যা বেলায় ডাক্তার ঘোষকে আমাদের বাড়ী আসতে দেখে ভাবলাম আবার বোধ হয় সিস্টার রোজীর জন্য নতুন কোন

সুপারিশ নিয়ে এসেছেন।

"আসুন" বলে সম্ভাষণ করতে গিয়ে মনে হল আমার গলার স্বরে কিছু অভিমান প্রকাশ পেল। ছড়ীটা রেখে ডাক্তার ঘোষ বসে বললেন—"কাল রোজী ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছে।"

"চাকরীতে ইস্তফা দেবার কথা আমি বলিনি, যাই হোক সে ওর নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে কমিটি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে উচিত বিচার করেছে এজন্য আমি খুশী।" উত্তেজনায় আমার কথায় ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

"ন্যায়ের অর্থ জানেন মিসেস কান্ত?" ডাক্তার ঘোষ-এর গম্ভীর স্বরে আমি চমকে উঠলাম।

" ও ব্যাপারটা তো চুকে গেছে, ও নিয়ে তর্ক করে লাভ কি ডাক্তার সাহেব?"

"একটা কথা শুনুন মিসেস কান্ত, মৃতকে মেরে যদি কেউ উল্লসিত হতে চায় তবে তার থেকে বড় পরাজয় আর কিছু নেই। রোজী আজ থেকে অনেকদিন আগেই হেরে বসে আছে। রোজীর জীবনের কথা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

"ডাক্তার সাহেব, রোজীর জীবনের আদি অন্ত শুনে আমার কি লাভ বলুন, বসুন আপনার জন্য চা আনি।"

"না, আপনাকে আজ ওর জীবনের ঘটনা শুনতেই হবে। আপনি ন্যায়পরায়ণতার দম্ভ করছেন, আমাকে ন্যায় বিচার করতেই হবে।

আজকের কঠোর স্বভাব সিস্টার রোজী বিশ বছর আগে যখন মেডিকেল কলেজে নার্সের চাকরী নিয়ে এসেছিল, তখন রোজীর অপূর্ব রূপ, মুগ্ধ ব্যবহার, মন ভোলানো হাসি সারা মেডিকেল কলেজকে পাগল করে তুলেছিল। অপরেশনের সময় রোজী যখন তার দক্ষ হাতে ডাক্তারদের সহযোগিতা করত তখন তার কোমল হাতের স্পর্শে ডাক্তাররা কখনও কখনও রোমাঞ্চিত

হয়ে উঠত। মৃদু সুগন্ধ বাতাসের মত রোজী ঘুরে বেড়াত। ডাক্তার শরদ সার্জারীর প্রোফেসর আমার সহপাঠী ছিলেন। যে রোজীকে পাওয়ার জন্য যুবক ডাক্তাররা স্বপ্ন দেখত, কে জানে কবে সে ডাক্তার শরদের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ওদের বিয়ের সময় না জানি ডাক্তার শরদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে কত ডাক্তারেরই না বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিল। ডাঃ শরদ রোজীকে পেয়ে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন ও রোজীও নিজের জীবনের গন্তব্য পথ খুঁজে পেয়েছিল।

প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন ডাঃ শরদ হাসপাতাল থেকে ছুটী নিয়ে বাড়ী ফিরে আসছিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডাঃ শরদের বন্ধুরা সপত্নীক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রোজী সারা বাড়ী সুন্দর করে সাজিয়েছিল। রজনীগন্ধার গন্ধে সারা ঘর ভরে ছিল। রোজী ডাঃ শরদের জন্য বেছে বেছে সুন্দর রজনীগন্ধা সরিয়ে রেখে-ছিল। ও কি ঐ সময় কখনও ভেবেছিল যে ঐ রজনীগন্ধা ডাঃ শরদের শবদেহের ওপর দিতে হবে!"

"কি" আমার বিস্মিত প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে ডাক্তার তার কথা আবার শুরু করলেন। সামনে থেকে বিদ্যুত গতিতে আসা একটা ট্রাক ডাঃ শরদের গাড়ীকে ধাক্কা মেরেছিল। ডাঃ শরদের আধখোলা ঠোঁটে হাসির আভাস, পাশে রোজীর জন্য কেনা নতুন শাড়ীর প্যাকেট অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

ঘটনার আঘাতে রোজী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। উদাস মনে ও ভাবছিল যে ওর জীবনকে শেষ করে দেবে না, ওর গর্ভে ডাঃ শরদের সন্তানকে জন্ম দেবে। মার মমতা কি জিনিস আপনি তো জানেন মিসেস কান্ত? রোজী নিজের আগত সন্তানকে জন্ম দেবার সিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়েছিল। এর পরের ঘটনাও কিন্তু স্বাভাবিক ছিল না। সুন্দরী রোজীর আশেপাশে স্তাবকের দলের চেষ্টার অবধি ছিল না। দু একজন তো বিবাহের

প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু রোজী দৃঢ় কণ্ঠে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল "রোজী মরে গেছে, এখন কেবলমাত্র একজন অনাগত শিশুর মা বেঁচে আছে। মার দায়িত্ব বড় কঠিন।' এই রকম অবস্থায় রোজী এক শিশু পুত্রের জন্ম দিল।"

হেমন্ত একদম ডাঃ শরদের প্রতিচ্ছবি। ওকে দেখে রোজী আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সত্যি যেন রোজীর পুণর্জন্ম হল। মুহূর্তের জন্যও রোজী তার শিশুপুত্রকে নিজের কাছ ছাড়া করত না। ডিউটির সময় হাসপাতালের সকল রোগীই ওর কাছে হেমন্ত তুল্য হয়ে উঠল। প্রত্যেক রোগীই ওকে আরও বেশীক্ষণ সময় কাছে পেতে চাইত। মাতৃত্ব গরিমায় গর্বিত রোজী তার সকল স্নেহ ভালবাসা দিয়ে রোগীদের সেবা করত।

হেমন্ত বড় হয়ে উঠল। বাবার প্রখর বুদ্ধি ও শান্ত গম্ভীর স্বভাব সে পেয়েছিল। হাসপাতালের নার্সদের কাছে সে যেন ছিল জীবন্ত খেলনা। রোজীর জীবনে কত অধরা বসন্ত এলো গেলো। ছোট হেমন্ত কিশোরে পরিণত হল।

বারো ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে যখন হেমন্ত আমাকে প্রণাম করতে পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল তখন ক্ষণেকের জন্য আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, ওকে আশীর্বাদ করার সময় আমার মনে হয়েছিল এমন একটি ছেলে যদি আমার হত!

হেমন্ত মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পেয়েছে খবর পেয়ে রোজী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। শহরের যত মন্দির মসজিদ গির্জা আছে সব জায়গায় পূজা দিয়েছিল ও গরীবদের প্রসাদ বিতরণ করেছিল। হেমন্তর চলে যাবার সময় রোজী একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। এই ক'বছর ও একলা থাকবে কি করে? সকলের সান্ত্বনা-বাক্য ও সহৃদয়তার পরও রোজী

রোজ রাতে কাঁদত, আমি পরেরদিন ওর লাল চোখ দেখে বুঝতাম। এক সপ্তাহ পরে রোজীর নামে একটা টেলিগ্রাম এলো। তাতে যা খবর ছিল, তা কি করে রোজীকে জানাব, কারণ তারটা আমিই সই করে নিয়েছিলাম।

সাধারণ একটা ঘটনার কী ভীষণ পরিণাম। র‍্যাগিং করার সময় কোন ছাত্র হেমন্তর মার অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ তুলে কোন অশ্লীল কথা বলেছিল। হেমন্ত রাগে উত্তেজিত হয়ে বোধ হয় কোন ছাত্রের কলার ধরেছিল। সিনিয়র ছাত্ররা হেমন্তর এ এ অশিষ্টতা মেনে নিতে পারেনি। অগণিত ছাত্রের হাতের হকিস্টিক্ হেমন্তের পিঠের ওপর পড়েছিল, কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত হেমন্ত একটুও দমেনি। বার বার বলা সত্ত্বেও হেমন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। ওর তেজদীপ্ত মুখ দৃঢ়তায় ভরা ছিল। হেমন্তর অশিষ্টতাকে শিক্ষা দেবার আগে ওরা হেমন্তকেই শেষ করে দিয়েছিল। হেমন্তের নিষ্প্রাণ শরীর দেখেই সিনিয়র ছাত্ররা ওকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল।

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের শরীরে যে আঘাত পড়েছিল আজও রোজী তা অনুভব করে। কি করে সে অত আঘাত সয়েছিল? যে কোনদিন একটু ফুলের ঘাও পায়নি সে মার সম্মান রক্ষার জন্য আমৃত্যু কি ভাবে অত আঘাত সয়েছিল। রোজীর মাতৃপ্রেম তার পুত্রকে বাঁচাতে পরেনি। পুত্র মার সম্মান রক্ষার্থে নিজের জীবন বলি দিয়েছিল।

সেদিন রাতে রোজী ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ডাক্তাররা তা হতে দেননি। জানেন মিসেস কান্ত আমরা আজ পর্যন্ত এক মৃত মাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আজ ও বৃদ্ধা, কটুভাষী, ও মার মমতা কি জানে? অনিতার কান্না শুনে আপনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন, একবার ঐ মার কথা ভাবুনতো যার শরীরের ওপর, মনের ওপর হাজার

হাজার হকিস্টিকের আঘাত পড়ছে, যার সামনে ক্ষত-বিক্ষত পুত্রের শরীর, মুখ অসীম শ্রদ্ধা সহকারে মার দিকে তাকিয়ে আছে। পুত্রের মৃত্যুর পরেও, আজও প্রতিক্ষণ ওর কানে পুত্রের করুণ কণ্ঠস্বর বেজে চলেছে।

কোন কিছু না দেখে না শুনে রোজী যন্ত্রবৎ রোগীদের সুস্থ করে তোলার কাজ করে চলেছে। ওর জীবনে যা ঘটল তা কি ন্যায়ের পথ ধরে ঘটেছে?

"আজও যে কোন বিচক্ষণ ডাক্তার রোজী ব্যতীত অন্য কোন নার্সের ওপর ভরসা রাখতে পারেন না।"

ডাক্তার ঘোষ কখন তাঁর লাঠিটি নিয়ে চলে গেছেন জানি না। আমার চোখের জলের সামনে একটি দৃঢ়চিত্ত করুণ যুবামুখ ভেসে উঠল। অন্তিম সময়েও ঐ তেজস্বী যুবকটি তার মার হাতের করুণ স্নেহ স্পর্শ পেল না।

"মা, মা আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব" অনিতা নয়, হেমন্ত যেন রোজীকে ডাকছে। না, না আমি রোজীর প্রতি কোন অন্যায় অবিচার হতে দেব না। চোখের জল মুছে আমি রোজীর বাড়ীর দিকে ধীর পায়ে হেঁটে চললাম।

লেখক পরিচিতি

শ্রীমতী ডঃ পুষ্পা সাকসেনা হিন্দি সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। জন্মস্থান এলাহাবাদ। হিন্দি এবং ভূগোলে এম, এ, পাশ করে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি, করেছেন। মারাঠী এবং গুজরাতি ভাষায় এঁর অনেক লেখা অনুবাদ হয়েছে। এঁর কয়েকটি গল্প টেলিফিল্ম হয়েছে। বর্তমানে ইনি রাঁচীর স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়ায় হিন্দি অধিকারী এবং শ্যামলী নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সমন্বায়ক।

লগ্ন বীথিকা চক্র

মৃত দেহটা সদর দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে যেতেই ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায় অনুরাধা। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নেয় সিন্দুর কৌটা। ওর কত দিন কত মাস কত বছর পার হয়ে গেছে সিন্দুর কৌটাটা খোলেই নি সে। রাগে দুঃখে অভিমানে চরম ঘৃণায় খুলে ফেলেছিল সে তার সকল এয়োতি চিহ্ন। মুছে ফেলেছিল সিন্দুর রেখা নিজের হাতে নির্মম ভাবে, তারপর বছরের পর বছর ভয়ানক নিঃশব্দ এক প্রতিজ্ঞায় প্রহর গুণেছে সে কবে আসবে আবার সিন্দুর পরার লগ্ন। অবশেষে এল সেই লগ্ন।

'বল হরি হরি বল'। হরি ধ্বনির শব্দ ঐ। পথের শেষ প্রান্তে মিলিয়ে যেতেই, কৌটটা খুলে ফেলে সিঁথিতে সিঁন্দুর রেখা টেনে দিয়ে কপালে একটা টিপ এঁকে দেয় অনুরাধা, আয়নার বুকে ভেসে ওঠে সুন্দরী বধুর প্রতিমূর্ত্তি, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুরাধার চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

এই কি সব ফিরে পাওয়া? প্রশ্নটা মনের মাঝে ঘুর্নি পোকার মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সারা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। এত বড় বাড়ীতে কটাই বা লোক? তার মধ্যে পুরষেরা সবাই গেছে শ্মশানে।

অনুরাধা বহুকাল বাদে তিনতলায় বড়জা মাধুরীর ঘরের সামনে দাঁড়ায়, দরজায় আলো ঝুলছে। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ে সাদা শাটিনের সেই বিছানাটা, টেবিলের ওপর পিতলের ভাসে এক গুচ্ছ রক্ত গোলাপ। বড়-বৌরাণী ছিল সৌখিন, বিলাসী। প্রতিদিন টাটকা ফুল তার লাগবেই। পুরানো সেই দিনটার কথা

মনে পড়ে যায় অনুরাধার। এ বাড়ীতে নূতন বৌ হয়ে এসে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বড়জা মাধুরীকে দেখে। কি অপূর্ব রূপসী; গানে, গল্পে, হাসি, কৌতুকে সকল কাজের মধ্যে থেকে সে মাতিয়ে রেখেছে সে বাড়ীটা, তাকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না, কিছু ভাবা যায়না। বড় বৌরাণী সত্যিই অপরূপা। মুহূর্তেই বড় জায়ের গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে গিয়েছিল সে। দুই বোনের মত, দুই বন্ধুর মত সুখের হাসিতে একটা বছর কেটে গেছে। তারপর একটু একটু করে তার চোখের সামনে থেকে রঙীন কুয়াশা কেটে গেছে।

প্রথমে কিছুতেই ঘটনাটা বিশ্বাস হয়নি, তারপর হয়েছে, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারেনি অনুরাধা। আর তখনই প্রচণ্ড ঘৃণায় অপমানে সিন্দুর মুছে সে নিজের ঘর ছেড়ে দোতলায় শাশুড়ীর ঘরে। আজ যেন বহু-যুগ পর পায়ে পায়ে সে এসে দাঁড়ায় তিনতলায় তার বন্ধ ঘরের সামনে। জানলা দিয়ে দেখতে পায় ৭ বছর আগে ঠিক যেমন ছিল তেমনি পরিপাটি করেই সাজানো রয়েছে সব। তার চলে যাওয়ার কোন কষ্ট কোন অভিমান জমে নেই ঘরের কোথাও। না নূতন করে আর কোন কষ্ট হয়না। অনুরাধার কষ্ট ভার অপমান আর উপেক্ষা সহ্য করতে করতে সব অনুভূতির ধার গুলিই যেন ক্ষয়ে গেছে আজকাল! তাই বোধ হয় এমন একটা মৃত্যুর দিনেই সে সিন্দুর পরল। ছাদে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে নিচের উঠান গোবর জল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে কাজের লোক হরিচরণ। স্বামীর মুখখানা যেন চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ওঠে। এই অসম্ভব শোকের মাঝে তাকে আচমকা এই সধবার বেশে দেখে কি ভাববে সে? রাগে ঘৃণায় জ্বলে উঠবে? না, সন্ধির সংকেত ভেবে সুখ না পাক একটু স্বস্তি পাবে? এই সিন্দুর সে যেদিন নিজের হাতে ঘসে ঘসে মুছে ফেলছিল তখন তার স্বামী দেবাশীষ চিৎকার করে উঠেছিল।

—এ তুমি কি করছ ? আমার সামনেই সিন্দুর মুছে ফেলছ ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? শাঁখা জোড়া খুলতেই, দেবাশীষ এসে তার হাতটা চেপে ধরেছিল।

—ছেড়ে দাও আমাকে, এক ঝাটকায় দেবাশীষের হাত ছাড়িয়ে খাটের কোণায় সরে গিয়েছিল অনুরাধা। রাগে, ঘৃণায় অপমানে মাথার ভিতর তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল তার।

—কেন এমন করছ অনুরাধা ? মিথ্যা সন্দেহে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ। দেবাশীষ এই সময়টা নিজেকে খুব সংযত রাখার চেষ্টা করছিল। ঝলসে উঠেছিল অনুরাধা।

—মিথ্যা ? মিথ্যাসন্দেহ ? চরিত্রহীন লম্পট,—পুঞ্জিভূত ঘৃণা গরলের মত উপচে পড়ছিল। দেবাশীষ এক দৃষ্টে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি করতে চাও ? ভাই এর সংসারে ফিরে যেতে চাও ?

—তাতে তোমার অবাধ অবৈধলীলার সুবিধা হয় ? দাঁতে দাঁত চেপে দেবাশীষের চোখে চোখ রেখেছিল অনুরাধা।

—যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। নিজের মেজাজকে সংযত রাখতে চাইছিল দেবাশীষ লোক-জানাজানির ভয়ে।

—না কোথাও যাবনা আমি। আমি আমার অধিকার নিয়ে, মাথা উঁচু করে এ সংসারে থাকব বিধবার বেশে জ্বলন্ত প্রতিবাদের মত। আমি তো কোন অন্যায় করিনি যে বাড়ী থেকে চলে যাব। আমি থাকব। আমি দেখব। কত ব্যাভিচার তুমি করতে পার ? তোমাদের প্রাণে কত ফুর্ত্তি আছে। কথাগুলো যেন জ্বলন্ত চাবুকের মত আছড়ে পড়ে দেবাশিষের ওপর। সে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে অনুরাধার আগুন-রাঙা মুখের দিকে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

এই সেই নম্র লাজুক অনুরাধা, যে কোন দিন উচ্চস্বরে কথা বলেনি। তার যে টুকু অভিযোগ ছিল কেঁদে কেটে অনুনয়

বিনয় করে, পাঁচ জনের কান বাঁচিয়ে। সেই অনুরাধার এই মূর্তি যেন কল্পনার অতীত। আর তার এই নম্রতার মুখোশটুকু ছুটিয়ে নিয়েছিল দেবাশীষ। ছলনা আর বাক-চাতুরিতে ভুলিয়ে রেখেছিল তাকে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি অপমান, উপেক্ষা আর মিথ্যাচার সয়ে সয়ে সেই নতমুখী মেয়েটা আজ এমন বিদ্রোহিনী হয়ে উঠবে।

একে সে চেনে না। এত কাছাকাছি থেকেও একে সে বোঝেনি, বোঝার চেষ্টা করেনি কোনদিন। অনুরাধা আয়নার সামনে এসে তোয়ালে দিয়ে সিঁথির সিন্দুর মুছতে থাকে, মনে হয় অসহ্য যন্ত্রণায় বুকটা তার ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। দেবাশীষ সে দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করে—রাজরাণীর কি গরীব ভাই-এর সংসারে ফিরে যেতে ভয় হচ্ছে ? শাকভাত, ছেড়া কাঁথা বোধ হয় এখন আর সইবে না ? দেবাশীষ এবার অন্য পথে আঘাত করার চেষ্টা করে তাকে। কারণ অনুরাধার ভাইদের অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ায় অনুরাধা কখনও সেখানে রাত কাটায় না। অনুরাধা ওর চোখে চোখ রেখে বলে।—ছল, চাতুরি যতই কর এ বাড়ী ছেড়ে গিয়ে তোমার কোন সুবিধা করে দেবনা।

—মিথ্যা সন্দেহটাকে বাড়িয়ে একটা নাটক করছ তুমি। লোকে হাসবে। দেবাশীষ জানলার ধারে এসে একটা সিগারেট ধরায়।

—কি বল্লে মিথ্যা সন্দেহ ? বারুদের স্তুপে যেন আগুন লাগে। জ্বলে ওঠে অনুরাধা, এখনও সেই মিথ্যা বোঝাবার চেষ্টা ? বাড়ী শুদ্ধ লোক, পাড়া প্রতিবেশীর হাসাহাসি কানাকানি দেখতে পাওনা ? দেখতে পাওনা মা'য়ের চোখের জল ? কি করে পাবে ? ঐ সর্বনাশা রূপের পায়ে সর্বস্ব দিয়েছ তুমি।

মনুষত্ব, বিবেক সব হারিয়ে বসে আছ যে। ছিঃ ছিঃ সে তোমার বড় ভাইএর স্ত্রী ছিঃ।

—আঃ, চুপ। চুপ কর তুমি। বড্ড বাড় বেড়েছে না? দেবশীষের মুখখানা রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে অনুরাধার গলাটা দুহাতে চেপে ধরে চিরদিনের মত বন্ধ করে দিতে।

—এত পাপ এত অন্যায় সইবেনা কিছুতেই সইবে না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে এসে শাশুড়ীর পায়ের ওপর সেদিন আছড়ে পড়েছিল অনুরাধা। খুলে ফেলেছিল সব গহনাগাঁটি। কালোপাড় মিলের ধুতি পরেছিল। এই আঘাতে শাশুড়ী যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন থেকে আর ফিয়ে যায়নি অনুরাধা তার ঘরে।

সব জেনে শুনে এত বড় ক্ষতি আমার কেন করলেন মা, কেন? চোখের জলে ভাসতে ভাসতেই শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করেছিল অনুরাধা।

—এমনটা যে হবে বুঝিনি ছোট-বৌমা। বড়-বৌমার ঐ সর্বনাশা রূপই কাল হল। ওদের বিয়ের একটা বছর কাটলনা। আমার অমন জলজ্যান্ত ছেলে নৌকা-ডুবিতে মারা গেল।

বড় বৌমার বাবা মা এসে ওকে নিয়ে যেতে চাইল। ও গেলনা। আমরা সবাই ওর আবার দিয়েও দিতে চাইলাম। বল্লে, করব না। লেখাপড়া শিখব দেওরের কাছে। কে জানত মা ছোট দেওরের মাথা চিবুবার জন্য ও বসে রইল। সেই হল শুরু। দিনরাত পড়াশুনা, হাসি গল্পেতে মেতে রইল সর্বনাশী। আমার এসব ভালো লাগাত না, কর্তাকে বলতাম, ওকে জোর করে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ছেলেটার আমার বিয়ে দাও। কর্তা শুনলেনই না। বলতেন,—'আহা এই কচি বয়েস। মেয়েটার কপাল পুড়ল। একটু হাসিগল্পে মেতে আছে, থাকনা', আসলে কি জানো মা? এ

সর্বনাশী সেবাযত্ন দিয়ে কর্তাকে বশ করেছিল। ওর কোন দোষ মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত উনি দেখে যাননি। কর্তা মারা যেতেই তাই অনেক দেখে শুনে তোমাকে আনলাম মা। যদি বুঝতাম ওদের ভিতর ভিতর এত অধঃপতন হয়েছে, তোমার এমন ক্ষতি আমি কিছুতেই করতাম না কিছুতেই না। তারপরও বৃদ্ধা দু বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু বড়বৌ আর ছোট ছেলের মুখ দর্শন করেন নি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত। অনুরাধা শাশুড়ীকে দোষও দিতে পারে না। সে নিজেও তো অনেক দিন পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। ওদের হাসি গল্প-গান সব সময় পাশাপাশি থাকা। ছুতয় নাতায় ছোঁয়া-ছুয়ি খেলা দেখেও মনে কোন রকম সন্দেহ হয়নি। শুধু একটা রাত্রের ঘটনা তার চোখ খুলে দিয়েছিল।

দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাট গায়ে লাগতেই গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অনুরাধার। সে তাড়াতাড়ি উঠে আলো জেবলেই অবাক হয়ে যায়। দেবাশীষ বিছানায় নেই, কোথায় গোলো? বাথরুমটা দেখে আসে অনুরাধা। না নেই। তবে কি এত রাত্রে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসল? দেবাশীষ মাঝে মাঝে গভীর রাত অবধি পড়াশুনা করত। অনুরাধা তার ঘর থেকে বেরিয়ে বৌরাণীর ঘরের খোলা জানলার সামনে এসেই বিস্ময়ে ঘৃণায় পাথর হয়ে গিয়েছিল। ঝড়-জলের সেই গভীর রাত্রে বিদ্যুতের আলোয় পলকে সে সব দেখেছিল। তাতে ঘৃণায় শিউরে উঠেছে, ছুটে গিয়ে ছিল সে চারতলার সিড়ি বেয়ে আত্মহত্যা করার জন্য। কিন্তু ছাদে যাবার দরজায় ঝুলছে তালা। এর চাবি থাকে বড় বৌরাণীর কাছে। এত বড় আঘাতে সমস্ত পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। সে তার কয়েক-দিন পরই সিঁথির সিঁদুর মুছে ঘর ছেড়ে শাশুড়ীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে একবাড়ী যখন, স্বামীর সাথে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে দেখা হয়েছে। চোখের সামনে নিজেরই বাড়ীতে

নিজের স্ত্রীকে বিধবা বেশে দেখা যে কি মর্মান্তিক কি লজ্জার তা হাড়েহাড়ে টেরপেয়েছে দেবাশীষ। প্রতিটি মুহূর্তে তার উপস্থিতি জ্বলন্ত প্রতিবাদের মত যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন কথা নয় শুধু নীরব তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টির সঙ্কেত। নিরাভরণা, বিধবার বেশে ঐ মূর্তি যখন তার সামনে দিয়ে চলে যায় দেবাশীষের মনে হয় ঐ বেশের আড়ালে সারা সমাজ যেন ভ্রূকুটি মেলে তাকিয়ে আছে। কৈফিয়ৎ চাইছে তার কাছে।

ওর ঐ রুক্ষ চুলের সাদা সিঁথিটা যেন কষাঘাত করেছে তার বিবেককে। অসহনীয় এক মানসিক যন্ত্রনায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে সে তখন ছুটে গেছে তার বৌরাণীর কাছে। আনন্দ আর আবেগে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে সব বাধা, সব প্রতিবাদ। কিন্তু এ কে? কোথায় সেই প্রাণ-প্রাচুর্যে-ভরপুর চিরযৌবনা বৌরাণী? অনুরাধার অভিনব আঘাতে এ যেন হয়ে গেছে পাষণ প্রতিমা।

অপরূপা সৌখীন বৌরাণীর অঙ্গে দুধসাদা গরদ। কোন অলঙ্কার নেই দেহে। হাসি উচ্ছ্বাস সেই কৌতুক কিছু নেই।

—দরজা খোল বৌরাণী, দরজা খোল একটি বার। তোমার জন্য আমার সব গেছে বৌরাণী। আমি আর পারছি না। শুধু একটি বার তোমার কাছে যেতে দাও। বন্ধ দরজায় পাগলের মত ধাক্কা দিয়ে চলে দেবাশীষ। কিন্তু সব আকুতিই ব্যর্থ হয় তার। ও পক্ষ নীরব, নিশ্চল। খোলা জানলার সামনে এসে ভিতরে তাকিয়েই চুপ করে যায় দেবাশীষ। এ কোন যোগিনী? ভিতরে মেঝেতে মোম জেবলে তার সামনে বসে আছে বৌরাণী। তার একঢাল সেই খোলাচুল লুটচ্ছে পিঠের ওপর। দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে এসেছে। অনুরাধার নিঃশব্দ প্রতিবাদের আগুনে জবলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে বৌরানীর কামনা বাসনা সব উচ্ছবলতা। মোমের আলোয় বৌরাণীর ঐ ধ্যান-মগ্না মূর্তির

দিকে তাকিয়ে অসহ্য এক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নিজের ঘরের শূন্য বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ে দেবাশীষ। আজ যেন মনে হয় বিছনাটা বড় ফাঁকা। বড় নিঃসঙ্গ লাগে। মাসের পর মাস কেটে চলে। দেবাশীষের মনে হয় সে বোধ হয় ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে। দাস দাসীদের চোখে কৌতূহল, পাড়া প্রতিবেশীদের উপহাস, আত্মীয় স্বজনের ঘৃণা দেখে, অহেতুক এদের ফিস্‌ফাস্‌ সহ্য হয় না। বৌরাণীও ত্যাগ করেছে। পারতপক্ষে সে নিজের ঘর ছেড়ে বেরয় না।

ভয়নাক অসহায় লাগে নিজেকে। নিজের বাড়ীতে নিজেকেই মনে হয় আসামি। সারাটা রাতই মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষরাত্রে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে।

হঠাৎ ঠাকুর-চাকরের চিৎকার চেঁচামিচিতে ঘুম ভেঙে তার ব্যালকনীতে ছুটে এসেই বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। নীচে বাগানে বেলগাছের তলায় ইটের পাঁজার ওপর পড়ে আছে বৌরাণীর নিথর রক্তাক্ত দেহটা। হাতে ধরা আছে তখনও কচি বেলপাতা শুদ্ধ একটা ডাল। ইটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। প্রতিদিনই ভোরবেলা ফুল বেলপাতা তুলে শিবপুজা করত বৌরাণী। চারতলার খোলা ছাদের ওপর এসে পড়েছে নিশ্চয় বেলপাতা পাড়তে গিয়েই। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। হয়ত একটা এ্যকসিডেণ্ট। তবু দেবাশীষের মনে হয়, বৌরাণী যেন স্বেচ্ছায় তাকে মুক্তি দিয়ে গেল। নিজেও মুক্তি পেল। এছাড়া যে তার আর কোন উপায় ছিলো না। ঐ অপরূপ সুন্দর মুখখানা থেৎলে বিভৎস হয়ে গেছে। ব্যথা বেদনা, কন্না কোন অনুভূতিই যেন নেই। শুধু মনের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। শ্মশান থেকে ফিরে ক্লান্ত পায়ে অবসন্ন দেহে তার বন্ধ দরজার কাছে আসতেই চমকে ওঠে দেবাশীষ। তার মনে হয় এ শুধু তার চোখের বিভ্রম। সালঙ্কারা অনুরাধা শ্বেতপাথরের গ্লাসে সরবৎটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় দেবাশীষ তাকায় অনুরাধার মুখের দিকে। তার কপালে জ্বলছে সূর্যের মত সিন্দুর টিপ।

আলোর অমাবস্যা ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

মানস সরোবরের ধারে একদিন ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে নন্দনকানন থেকে সদ্য তুলে আনা পারিজাতের মালা গাঁথতে গাঁথতে পার্বতী বললেন নন্দীকে, "শোন, অনেকদিন হল লক্ষ্মী সরস্বতীর কোন খবর পাই না। আমার মনটা খুব ব্যস্ত হয়েছে। লক্ষ্মীত কোনদিনই চিঠিপত্র লেখে না, ঘর সংসার নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু সরস্বতী তো চিঠি লিখত। কি হল, না হল তুমি গিয়ে সশরীরে খোঁজখবর করে আসবে।"

"যো হুকুম" বলে নন্দী বেরিয়ে পড়ল কৈলাস থেকে বৈকুণ্ঠের পথে। পারিজাতবন পেরিয়ে নন্দনকাননের ধার দিয়ে ইন্দ্রের রাজসভা কাটিয়ে নন্দী যখন বৈকুণ্ঠে পৌঁছল তখন সন্ধে হয় হয়। খিদে তেষ্টায় অস্থির হয়ে নন্দী আগে সরস্বতীর ঘরে না গিয়ে লক্ষ্মীর ঘরের দিকে হাঁটা দিল। কিন্তু ঘরে পৌঁছবার আগেই চেঁচামেচি শুনে দাঁড়িয়ে যেতে হল। ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই দূর থেকে দেখতে পেল লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনে ঝগড়া করতে করতে যেন এদিকেই আসছে।

নন্দী ভয়ে জড়সড় হয়ে যোড়হাত করে বলল, "মায়েরা তোমরা এমন করছ কেন? আমি তোমাদের কুশল সংবাদ নিয়ে পার্বতী মায়ের কাছে ফিরে যাব।"

কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতী কোন কথায় কান না দিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চালিয়েই যেতে থাকল। অবশেষে নন্দী আর কিছু না বলে ওদের কথাবার্তায় কান দিল। সরস্বতী বলছে লক্ষ্মীকে, "তোমাকে আমি সব দিয়েছি। স্বামী সংসার সব। কিন্তু তোমার এ কী ব্যবহার! মর্তের মানুষের লোভের সুযোগ নিয়ে সমস্ত পুজো একপেশে করে নিচ্ছ।"

লক্ষ্মী প্রতিবাদের সুরে বললে, "এ তোমার ভুল ধারণা

সরস্বতী। মর্তে গিয়ে খোঁজ করলেই তোমার এ ভুল ভেঙে যাবে।"

কথোপকথনের মধ্য নন্দী এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। ওরা নন্দীকে দেখে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থামিয়ে বলল, শোন, আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা বাগ্‌বিতণ্ডা তৈরী হয়েছে। এর নিষ্পত্তির জন্যে আমরা মর্তে যাচ্ছি। তুমি পার্বতীমাকে আমাদের কুশল জানিয়ে বোল আমরা ভালই আছি। কিন্তু এখন খুব ব্যস্ত। তাই চিঠি লিখতে পারলাম না। ঘুরে এসে সব জানাব।"

নন্দীর সামনে দিয়েই ওরা দুজনে হুস্‌ করে মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল। নন্দী কি আর করে! খিদে তেষ্টা চেপেই আবার কৈলাসের দিকে পা বাড়াল।

এদিকে লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে গেছে মর্তে তখন বিকেল গড়ান অন্ধকার। কিন্তু এ কী ব্যপার! চারিদিকে এত আলোর রোশনাই, হিন্দী-বাংলা গানের ছড়াছড়ি! দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে গা ঢাকা দিয়ে এগোতে থাকল। চারিদিকে বিভিন্ন মাপের সব প্যাণ্ডেল। কি যেন পুজো হচ্ছে না! দুজনে হতবাক হয়ে কি পুজো, কার পুজো এসব দেখতে প্যাণ্ডেলের দিকে পা টিপেটিপে এগোতে লাগল।

প্যাণ্ডেলে পৌঁছে কিন্তু দুজনেই থ। প্রতিমার মুখে ত লক্ষ্মী সরস্বতী কারোরই আদল নেই। বরং দেয়ালে লাগান কোন একটা সিনেমা পোষ্টারের নায়িকার মুখের মত অনেকটা। দু বোনে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। তবে কার পুজো করছে আজকাল মর্তের মানুষেরা।

ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করবার জন্যে দু'বোনে ভেবে চিন্তে ঠিক করল প্রথমে যাবে অর্থমন্ত্রীর কাছে, পরে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে।

বিষয়টার ভালমত একটা বিহিত হওয়া দরকার।

অর্থমন্ত্রী তখন সবে মিটিং সেরে বাড়িতে এসেছেন। ডিভানের ওপরে পা ছড়িয়ে ব'সে সবে নিউজ পেপারটায় চোখ বোলাচ্ছেন, লক্ষ্মী সরস্বতী এসে হাজির। অর্থমন্ত্রী ওদের দু'জনকে দেখে চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কারা? কি চাও এখানে?"

লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনেই একসঙ্গে কোন ভূমিকা না করে জবাব দিলেন, "আজ কিসের পুজো আমরা তাই খোঁজ করতে এসেছি।"

এবার অর্থমন্ত্রী একটু মুচকে হাসলেন। "পুজো কোথায়? ও ত উৎসব হচ্ছে।"

"সে কী! আমরা প্রতিমা দেখে এসেছি।" দু'বোনে বিস্ময়ে থ।

অর্থমন্ত্রী সপ্রতিভ হয়। "মায়েরা, তোমরা ভুল করছ। তোমরা প্রতিমা দেখনি। পুতুল দেখেছ। আজকাল মর্ত্যের মানুষেরা আর পুজো করে না। পুতুল বানিয়ে মাঝে মাঝে উৎসব করে।"

"কী!" লক্ষ্মী এবার রাগে ফেটে পড়ে। "আমার দৌলতেই মর্ত্যবাসীদের এত বাড়বাড়ন্ত আর আমাকেই তারা ভুলে গিয়ে পুতুল বানিয়ে উৎসব করছে!"

অর্থমন্ত্রী এবার লক্ষ্মীকে চিনতে পারে। যোড়হাত করে বলে "মা, দোষ নিও না। মর্ত্যের লোকেরা তোমার পুজো তুলে দিয়েছে। তারা বলে কি না, যা হোক একটা সার্টিফিকেট না থাকলে ত তোমাকে পাওয়া যায় না। তবে আর তোমার পুজো করে কি হবে।"

এবার সরস্বতী এগিয়ে আসে। "কিন্তু তারা ত আমার পুজোও করে না।"

অর্থমন্ত্রী কাঁদ কাঁদ হয়। "মা, তোমার দয়া ত আমার উপর কোনদিন ছিল না। তাই এ ব্যাপারটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং তোমার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাও। তিনি তোমাদের ভাল করে সব বুঝিয়ে বলবেন।"

অগত্যা আর কি করা! দু'বোনে আবার অদৃশ্য পথে হাজির হল শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি।

শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে তখন জোর মিটিং। আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমির পরীক্ষার প্রশ্ন কোথায় কি ভাবে তৈরী হবে, সে নিয়ে চাঁইদের মধ্যে তখন জোর কদমে আলোচনা চলছে। কথাগুলো শোনবার জন্যে দু'বোন গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল। প্রশ্ন কারা তৈরী করবে, এবং পরীক্ষার আগের দিন স্পেশাল কোচিং সেন্টারগুলো কি ভাবে সেই প্রশ্ন উত্তর পত্র সমেত ছাত্রদের কাছে পেঁাছে দেবে, সে নিয়ে বিষদ তর্কবিতর্ক। তারপর পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র পেঁাছনর পরে কি ভাবে বাইরে থেকে শিক্ষকেরা বন্ধুবৎসল ছাত্রদের মাধ্যমে ছাত্রদের হাতে উত্তর পেঁাছে দেবেন, সে কার্যবিধিরও একটা ছক তৈরী হল না। আলোচনা যখন প্রায় মধ্যগগনে দু'বোন সামনে এসে দাঁড়াল। শিক্ষামন্ত্রী সমেত সকলেই ভুরু কুঁচকে তাকাতে সরস্বতী নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি সরস্বতী, আর এ হল লক্ষ্মী। মর্ত্যে আমাদের পুজো কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে খোঁজ নিতেই আমরা এসেছিলাম তোমাদের আলোচনা শুনে ব্যাপারটা অনেকটা বোধগম্য হল।"

শিক্ষামন্ত্রী এবার হাতজোড় ক'রে বলল, "মা, দোষ নিও না। একসময় তোমার দয়ায় কিছু পড়াশুনা শিখেছিলাম। কিন্তু গদিতে বসার পর থেকে অনেক কিছুর সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছি যে এখন দু'লাইন নির্ভুল লিখতেও পারি না। তাই এখন যারা নতুন লেখাপড়া শিখতে আসছে তাদের মেধার থেকে ভাগ্যপরীক্ষাই আগে করা হয়। আসলে ভাগ্যটা ঠিক থাকলে জীবনে

একটা না একটা গদি ত পেয়ে যাবেই।"

দু'বোনে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মর্ত্যের মানুষেরা এখন মেধা বা পৌরুষকে গুরুত্ব না দিয়ে ভাগ্যের দোহাই দিতে শিখেছে। তারা পুজো না করলেও ফিল্মী হিরোইনের মূর্তি বানিয়ে উৎসব করে। বিরস মুখে লক্ষ্মী-সরস্বতী আবার মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ে—বৈকুণ্ঠের পথে না কি আরও অন্য কোথাও, কে জানে!

লিটল ম্যাগাজিন ও স্বউদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের যথাযথ প্রচার ও বিক্রয়ের একমাত্র দায়বদ্ধ অব্যবসায়িক উদ্যোগ—

রা ম ধ নু

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২, এস. পি. সি. ব্লক, কাজিপাড়া, বাঘাযতীন, কলকাতা-৭০০০৯২

তিন কপি করে ঋত্বিকা ও বই পাঠানো যেতে পারে। বিক্রি হয়ে গেলে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

সুসংবাদ

'অনুরাগ' ষষ্ঠ ও সপ্তম সংকলনে তার আর্থিক দায়িত্বের খবর পেয়ে কবি শ্রীমতী সিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরাগের জন্য এক হাজার টাকা দিয়েছেন।

'অনুরাগ'-এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধীরা ভট্টাচার্য, সম্পাদক—অনুরাগ।
৫ আগস্ট ১৯৯৬

শিক্ষক দীপককুমার গুপ্ত

দীপংকর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিল। রাগসঙ্গীত শিখতে চেয়ে যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তিনি পুরুষ না নারী—বোঝা যাচ্ছে না। শুধু পদবী আর ঠিকানার উল্লেখ আছে। আবার বলা আছে বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী গান শেখানোর কথা। তা সে বিষয় তো বিশাল ও ব্যাপক। নজরুলের রাগ-প্রধান গান, ভজন, শাস্ত্রীয়, লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সব রকম গানই এই সংজ্ঞায় এসে যায়।

সে কিছুটা কৌতুকও বোধ করলো। চিঠি পাঠাবে কি না—ভাবছিল। গানের শিক্ষকতা সে কয়েক বছর ধরে করছে। নিজ বাড়িতে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে শনি রবিবার সকাল ও বিকেলে গান শেখানোয় নিজেকে ব্যাপৃত রাখার সঙ্গে সঙ্গে দুটো কাজও একবারে সেরে নিচ্ছে। নিজের কিছুটা রেওয়াজ হবার পাশাপাশি আছে কিছু বাড়িতে অর্থাগম, যা এখন তার একান্তই। দরকার। তার আসল পেশা কিন্তু চাকরি। একসময়ের একটা নামী সওদাগরি সংস্থায় সে গাণনিকেয় দায়িত্বে রয়েছে বটে—কিন্তু সে সংস্থার জীবনদীপ নিভু নিভু। বেশ কয়েক বছর ধরে এই অবস্থা চলছে। বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে যে কোনও দিন। তাই, বাড়তি আয়ের কিছু ব্যবস্থা না করে নিলেই নয়। জিনিস পত্রের দাম ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। তার মতো চার পাঁচ জনের ছোট সংসারে মাসিক খরচ সব মিলিয়ে চার হাজার টাকার উপর।

তাই, বিজ্ঞাপনটা তার কাছে আশ্চর্যের বা কৌতুকাবহ যাই মনে হোক্ না কেন, লিখবে কিনা ভাবতে ভাবতেই দুমাস দেরী করে ফেললো। এক সন্ধ্যায়—অফিস ফেরত তার স্ত্রী রুপালী সংসার চালানোর জন্য আরও খরচা দেবার কথা বলাতে তার মনে

পড়লো, বিজ্ঞাপনের সেই শিক্ষকতার কাজের বিষয়ে সে আর খোঁজই করলো না। গিন্নীকে প্রসঙ্গটা তখনই জানিয়ে বললো, 'একবার চিঠি লিখে দেখলে হয় না?

তারা কি তোমার জন্য বসে থাকবে? নিশ্চয়ই এদ্দিনে কেউ না কেউ তালিম দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। তুমিই বা কী রকম? দুমাসের উপর চুপ ক'রে বসে রইলে?

তোমার এই গা-ছাড়া মনোভাবের জন্য দুবছর আগে একটা অফিসের চাকুরির দরখাস্ত দেরীতে পাঠিয়েছিলে—পরে, 'রিগ্রেট লেটার' পেয়েছিলে মনে পড়ে?'

'সে কথা এখন বলে কী লাভ?' দীপংকরের নিজেকে একটু যেন অপ্রস্তুত, বলে মনে হ'লো, বললো, 'তা হলে একবার লিখে দেখা যাক্—কী বলো? 'চিঠি পাঠাতে বাধা নেই। তবে এত দেরী করে ফেললে যে কাজ দেবে কিনা সন্দেহ আছে।'

দীপংকর হাত-মুখ ধুয়ে চা-পর্ব সারার আগে সেদিনের কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে নিল। তার ব্রিফ-কেস থেকে বিজ্ঞাপনের অংশটুকু বার করে আরেকবার বিষয়-বস্তু ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করলো। বিজ্ঞাপন যে দিয়েছে, তাকে সাধারণ শিক্ষার্থী বলে মনে হলো না। হয়তো সঙ্গীতের ব্যবহারিক দিকটা বেশ কিছুটা রপ্ত ক'রে নিয়েছে, অথবা মোটামুটি ধারণা আছে। সে রকম ছাত্র-ছাত্রীদের শিখিয়ে তৃপ্তি। পরিশ্রমও তুলনামূলক ভাবে কম।

গানের শিক্ষক শিক্ষিকারা রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে। সে রাস্তায় সচ্ছন্দে হেঁটে যাবার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের। তার জন্য ধৈর্য্য, অধ্যাবসায় থাকা চাই। মন দিয়ে রেওয়াজ করতে হবে। সুর ও তালের বোধ সব থেকে বড় কথা।

অনেক ভেবে সে পরের দিন চিঠি পাঠালো বিজ্ঞাপন দাতার ঠিকানায়। এলাকাটা টালিগঞ্জ থানার কাছেই। সে রাস্তা দিয়ে

দীপংকর প্রায়ই যাতায়াত করে। দুমাস পার হ'লেও কোনও উত্তর না আসায় দীপংকর বুঝে নিল, কেউ তালিম দেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভুলতে চাইলো সে। রূপালী এমনই এক সন্ধ্যায় কর্তাকে প্রশ্ন করলো, 'তোমার সেই ট্যুইশনির ব্যাপারটা কী হলো? চিঠি লিখেছিলে?

'লিখেছিলাম বৈ কি। দুমাস কেটে গেছে। এখনও ওদিক থেকে উত্তর আসে নি। আমি তো বলেছিলাম, অতো দেরীতে চিঠি পাঠালে কোনও লাভ হবে না। আমার অনুমানের সঙ্গে মিললো তো?

'বুঝতেই পারছো, ওরা নিশ্চয়ই কাউকে শেখানোর জন্য রেখেছে। সুতরাং হা-হুতাশ করার কিছু নেই।

'সব জায়গাতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বুঝলে? আগে চিন্তাভাবনা করলে হয়তো ফল ফলতো।'

'এ বিষয় নিয়ে এ্যাতো ভাবার কী আছে, বলো তো? আমাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রী তো কম নয়। তা ছাড়া, বাড়ি গিয়েও তো শেখাচ্ছি। ওদের মাধ্যমেই আরও খবর আসবে।'

পরের সপ্তাহের সোমবার অফিস-ফেরত সন্ধ্যায় বাড়ি পেঁাছে আলপনা দে নামে এক বিবাহিতা মহিলার চিঠি পেলো সে। আদ্যোপান্ত পড়ে সে লেখিকার ভাষার ধরণ তার পছন্দ হলো না। প্রথমেই খটকা লেগেছে চিঠির তারিখ নিয়ে। তিনমাস আগের তারিখ। টালিগঞ্জের সাদার্ন মার্কেট থেকে গড়িয়ায় চিঠি পেঁাছতে এতদিন লেগে গেল? ডাকঘরের প্রাপ্তির ছাপ তিনদিন আগেকার। ডাক-কর্মীর চিঠি পেঁাছে দিতে সামান্য দেরী হলেও সে মহিলা নিশ্চয়ই তারিখটাকে ৩ মাস পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? মহিলা নিজ সম্পর্কে অনেক গুণকীর্তন করেছেন। তিনি সাধারণ ছাত্রী হিসেবে নিজেকে মনে করেন না। শ্রুতির ভিত্তিতে শিখবেন না তিনি। স্বর-

লিপিমাফিক তাকে গান তোলাতে হবে। এক একদিনে একটা সম্পূর্ণ গান, তা উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত. নজরুলের রাগপ্রধান, ভজন, ঠুংরী খেয়াল যাই হোক না কেন। আধুনিক গানও থাকবে। সপ্তাহে ২ দিন যেতে হবে। চিঠিতে ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছেন।

দীপংকর চিঠিটা রূপাকে দেখিয়ে বললো, 'তুমি যে ধারণা করেছিলে অর্থাৎ চিঠি লিখে লাভ হবে না, শুধু সে প্রসঙ্গে গিয়ে বলি আমার চিঠির উত্তর দেবার সৌজন্যটুকু শ্রীমতী দে দেখিয়েছেন। পরে অন্য কথা বলবো।

'তুমি আসার আগে পোস্ট-কার্ডটা আমি পড়েছি। একজন বিবাহিতা মহিলার বাড়িতে গিয়ে শেখাবে?

কৌতুক করার ইচ্ছাটাকে সে চেপে রাখতে পারলো না। হেসে জবাব দিল, পার হয়ে যাওয়া মহিলাকে তালিম দিতে অসুবিধে কোথায়? তিনি কি তার রূপ-যৌবন নিয়ে আমাকে আকৃষ্ট করবেন? বা সে রকম আরও অন্য কিছু?'

'যদি করেই ফেলেন...

'মিছে ঘাবাড়াচ্ছে। আমার আর তার দুজনেরই লাইসেন্স আছে, জড়িয়ে যাবার ভয় নেই। ডাগর মেয়েদের তো বহুদিন ধরেই গান শেখাচ্ছি। দুর্বলতা এখনও পর্যন্ত কোনও দিক থেকে দেখা যায়নি।

'ঐ মহিলা যেভাবে শিখতে চান—সে সব শর্ত মেনে নিয়ে তাকে শেখাতে যাবে?', 'আরে একটু আগে সে কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। শুনে শুনে গায়কী আরও না ক'রে শুদ্ধ স্বরলিপি দেখে গান তুললে তা যে নিষ্প্রাণ হয়—তা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ। তুমিও গানের শিল্পী।'

'সে তো সত্যি।'

'তারপর একদিন, একটা ক'রে গান সম্পূর্ণ তুলবেন বলে লিখেছেন—কিছু বলবে এটা নিয়ে?

'পাগলামো! স্রেফ বাতিকগ্রস্থ বলবো ঐ মহিলাকে। 'এ পরবাসে রবেকে'র মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত ১৫ বার শুনেও কি গাওয়া যাবে—যদি স্বরলিপি সব না চেনে, গায়কী আয়ত্ত না করে?'

'তারপর দেখ, নজরুলের রাগপ্রধান গানের শৈলী আলাদা। 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া কুহরিল' গানটা তুলিয়ে দিলেও ঠিকমতো সমে-এসে মেলানো কঠিন। শচীনদেব বর্মণ আর অখিলবন্ধু ঘোষ পেরেছিলেন! জ্ঞান গোস্বামীর গানের কথা তো বললামই না।

'ভজন আবার স্বরলিপিমাফিক হয় না কি? কতো কি নতুন শুনবো!'

ঠুংরী বা ভজনকে স্বরলিপির শৃংখলে আবদ্ধ করলে যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না।

রূপালী কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললো, আমার মনে হয়, সময় কাটানোর জন্য সে মহিলা গান নিয়ে খেলাখেলা করতে চান।

'হতে পারে, আবার নাও পারে। রাগাশ্রয়ী গানের সঙ্গে আধুনিক গানও শিখতে চান মিসেস দে।

রূপা হেসে মন্তব্য করে, 'ওর দ্বিতীয় সন্ধ্যা মুখার্জী হবার ইচ্ছে হয়েছে, বুঝলে?'

'হুঃ! আবার খেয়াল, ঠুংরীও শেখার ইচ্ছা। তা হলে তো বলতে হবে, যদু ভট্ট আর এ যুগের সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর পর শ্রুতিধর হিসেবে তার নামই করতে হবে। একদিনে একটা রাগের উপর খেয়াল? কেউ কখনো তুলতে পেরেছে—না কি পারা যায়?'

'খেয়াল শিখতে গিয়ে খামখেয়ালী হলে দেখবে, শেষপর্যন্ত বদখেয়াল না হয়ে যায় আর তোমাকে অপদস্থ না করে।'

একটু ভেবে দীপংকর বলে, 'মিসেস দে ফোনে যোগাযোগ

করতে বললেও ভাবছি, আর একটা চিঠি পাঠিয়ে জেনে নিই—এদ্দিন পর ঐ চিঠি লেখার কারণ কী ? মনে হয়, নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে।'

সে তার আর এক গুরুবোনকে চিঠিটা পড়ানোর পর তার মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বললেন,'দীপংকর, আমি ২৫ বছর ধরে গান শেখাচ্ছি। রেডিয়োতে নিয়মিত অনুষ্ঠানও করেছি। এ ধরণের উন্নাসিক মহিলা তো দেখিনি! এরা কি গানবাজনাকে জলের মতো সোজা মনে করে ? আমরা তা হলে সাধনা করলাম কেন ?'

'দিদি, এই রকম কিছু অর্বাচীনদের পাল্লায় পড়ে গান বাজনার মাহাত্ম্য নষ্ট হতে যাচ্ছে। আমি চিঠির মাধ্যমে আরও খবর জানতে চাই—এ বিষয়ে কিছু বলুন। 'তা লিখে দেখতে পারো। তুমি শেখাবে কিনা—তা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা। কথা বলে বুঝতে পারবে, কতোটা সে তৈরী আছে। তার গান শুনবে। দরকার হলে, তুমিও বুঝিয়ে দেবে—তুমি কতোটা জানো।'

'যে সব শর্ত চিঠিতে আছে—তা আমার পছন্দ নয়।',

'বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে যা করার করবে।

সঙ্গীতগুরু বা আচার্যার তালিম দেবার বিষয়ে যেখানে স্বাধীনতা থাকে না, নির্দেশমতো চলার প্রশ্ন এসে যায়, সেখানে প্রাণোচ্ছল খুশি মনে গান বাজনা শেখানো যায় কি ? টাকা দিয়ে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না।

দীপংকর ঠিক করলো, মহিলাটিকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। চিঠির উত্তরে শিষ্টাচার জানিয়ে লিখলো, তার সাথে সে দেখা করতে ইচ্ছুক। ফোনে এই বিষয়ে সব কিছু বলা সম্ভব নয়। সেই মহিলার কাছ থেকে ৩ মাস পরে লেখা চিঠির কারণও জানতে চাইলো সে।

এক সপ্তাহ পর আলপনা দে ফোনে জানালেন, দীপংকর যেন

সে হপ্তার শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে যায়। অফিস-ফেরত সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিন্নীকে বললো, 'আমার ২য় চিঠি পেয়েই মিসেস্ দে আজ অফিসে ফোন করেছিলেন। আগামী শুক্রবার দেখা করতে যাচ্ছি।'

'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে জিরিয়ে নাও। চা ব্লাকস্ আনছি। ও বিষয় পরে কথা বলবো।

দীপংকর রুটিন মাফিক কাজ সেরে পোষা স্পিজ্ কুকুরটাকে সামনের রাস্তায় ৩।৪ বার ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। চায়ের আসরে বসে তার প্রথম কথা, 'আমার পরের চিঠিকে আলপনা দে একটু গুরুত্ব দিয়েছেন—না হলে সাতদিনের মধ্যেই যোগাযোগ করলেন কেন ?'

চাওমিনের প্লেটটা দিয়ে রুপালী প্রশ্ন করে, 'সেই মহিলার কথা ফোনে শুনে অল্পবয়সীর গলার স্বর বলে মনে হলো—না কি কিছুটা ভারী আওয়াজ ? এত তাড়াতাড়ি তোমার সাথে তিনি দিন ঠিক ক'রে ফেললেন.....,

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দীপংকর বললো, 'তোমাদের মন খুব সন্দিগ্ধ। শুধু তো ফোনে কথা হলো, কানাকানি হয় নি। এখনও তাকে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, একটু বয়স্কা মহিলার গলার স্বর শুনলাম বলে মনে হলো।

সে কথায় রুপার স্বস্তির ভাব দেখা দিল। বললো, 'দেখা করতে যাবে, তা যাও। কিন্তু মহিলা যেন তোমাকে টেক্কা দিতে না পারেন।'

'কিসে তিনি আমাকে টেক্কা দেবেন ? গানে না কথায় ? এমন প্রসঙ্গ তুলবো যে তার ধাক্কায় তিনিই হবেন কাবু, বুঝলে ?'

'তা সামনের শুক্রবার তুমি না ফেরা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।'

দীপংকর চা পানান্তে একটা উইলস্ ফিল্টার ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে রিং করতে শুরু করলো। চিন্তার জাল বুনতে বুনতে সে

প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিল, আলপনা দের মতো শিক্ষার্থীনিদের দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ নয়। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা গান শেখার নামে খাতা ভর্তি করতে চায়। কোনও গানই মন দিয়ে রেওয়াজ করে না। একদিনে একটা গান নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা কি সোজা না কি? সৃজনশীল কিছু ক'রে দেখাতে গেলে ধীর, স্থির, শ্রদ্ধাবান, সংযত হ'য়ে রেওয়াজে বসতে হবে। নিরলস সাধনার পর আসে উৎকর্ষতা, নৈপুণ্য। কোনও মহৎ কাজে ব্রতী হয়ে সাফল্য লাভ করতে গেলে চিন্তাভাবনা করে শনৈঃ শনৈঃ এগোতে হবে। রাতারাতি শিল্পী হতে পেরেছে কেউ?

সেই শুক্রবার অফিস-ফেরত সন্ধ্যায় দীপংকর ঠিকানা অনুযায়ী বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল বাজাতে একটু পরেই এক সুবেশা স্মার্ট মহিলা দরজা খুলতেই দীংকরের প্রশ্ন, 'আমি মিসেস্ আলপনা দের সাথে দেখা করতে চাই। তিনি বাড়ি আছেন কি?'

উত্তর দেবার আগে মহিলার পাল্টা প্রশ্ন, 'আপনার নাম? কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমি দীপংকর সেন, গড়িয়া থেকে এসেছি, মানে এ সন্ধ্যায় আমারই আসার কথা ছিল।'

'ওঃ! আসুন, ভিতরে আসুন। আমিই আলপনা দে। সোফাটাতে বসুন।'

দীপংকর শুভেচ্ছা জানিয়ে সোফাতে হেলান দিয়ে বসলো। লম্বা আকারের ঘর। এ মুখো ও মুখো ৪টে সোফা সেট ঘরের অনেকটা জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে।

মাঝখানে এক চিলতে জায়গায় সাধারণ মানের কার্পেট বিছানো। দেয়ালে রয়েছে কয়েকটা ওয়াল-প্লেট। ঘরের চার-কোণে তাকিয়ে কোনও তানপুরা চোখে পড়লো না। তার প্রশ্ন, 'এই ঘরে বসেই আপনি গানের রেওয়াজ করেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'হার্মোনিয়ামে করেন না কি তানপুরা নিয়ে করেন?'

'হার্মোনিয়ামেই বেশী প্রাকটিস্ করি। তানপুরায় গান ভালো আসে না।'

দীপংকরের এবার অবাক হবার পালা। ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক পর্যায়ে হার্মোনিয়ামে অভ্যাস করলেও ৩।৪ বছর পর তাদের তান-পুরায় গলা সাধতেই হবে, না হলে কণ্ঠে সুরের স্থায়ীত্ব আসবে না। ইনি চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তার সঙ্গে নিজ গুণকীর্তনের সারাংশ মিলছে না। আলপনা দে জানতে চাইলেন, সে সবরকম গান শেখায় কি না।

'আপনি বিজ্ঞাপনে রাগাশ্রয়ী গানের কথা লিখে পরে চিঠিতে জানালেন, নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান, নজরুলগীতি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও কিছু আধুনিক গান শিখতে চান। তবে হ্যাঁ, সবরকম গান শেখানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

'দেখুন, আমি নজরুলের ৭৫ খানা রাগভিত্তিক গানের লিস্ট ক'রে রেখেছি। তাঁর আধুনিক, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, পল্লীগীতি আমার পছন্দ নয়। ওসব শিখে কী হবে? রাগপ্রধান গান আমাকে শেখাতে হবে।'

মহিলার ঔদ্ধত্য দেখে দীপংকরের মেজাজ বিগড়ে গেল। নজরুলের ঐ সব গানের বিষয়ে আজ পর্যন্ত সে অন্য কাউকে এ ধরণের মন্তব্য করতে শোনে নি।

আলপনা দে আবার শুরু করেন, 'আমি নজরুলগীতি নিয়ে আকাশবাণীতে অডিশন দিতে চাই।

সে এবার মহিলার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। বয়স আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে। বব-ছাঁট চুল, ভ্রূদুটো, ছাঁটা, মাঝখানে বিন্দির টিপ। হঠাৎ দেখলে কোনও উড়ন্ত পাখি ডানা মেলেছে মনে হবে। চাকরি করেন বলে মিসেস দে জানালেন।

দীপংকর বলে, 'অভিশন দেবেন, ভালো কথা। আপনাকে বিভিন্ন স্বাদের ১৫টা নজরুলগীতির তালিকা পাঠাতে হবে। শুধু রাগপ্রধান গানের উল্লেখ থাকলে তো হবে না।' একটু থেমে সে প্রশ্ন করে, 'আপনি এতরকমের গান শিখতে চান।

সংসারের দায়-দায়িত্ব আছে। আছে অফিস যাওয়া-আসা, কাজের চাপ। এসব সামলে সপ্তাহে দুটো দিন আপনি বসবেন বলে বলেছেন। কিন্তু রেওয়াজ ক'রে একটা গান পুরো তুলতে সময় পাবেন? কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম্। আমি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনার কাছে জানতে চাইছি।

'সে ঝামেলা সামলাবার ব্যাপারটা একান্ত আমার। আপনাকে তা ভাবতে হবে না।'

আলপনা দে কতোটা তৈরী আছেন, তার গান না শুনলে বোঝা যাবে না। শিখবার আগে অনেকেই বড় বড় কথা বলে। গাইতে বললে সুর, তাল, লয় হারিয়ে ফেলে। সে ভাবলো, গাইতে বলার আগে জেনে নেওয়া উচিৎ—কার কার কাছে আগে তিনি তালিম নিয়েছেন।

'আপনি নজরুলগীতি শিখতেন কার কাছে?

'সৌরভী দত্তর কাছে, পাঁচ বছর শিখেছিলাম। পছন্দমতো গান দেন না বলে এখন তার কাছে যাই না।

অবাক হয়ে যায় দীপংকর। লব্ধ প্রতিষ্ঠা শিল্পী শ্রীমতি দত্তের কাছে শিখে আল্পনা দে তার মতো স্বল্পখ্যাত শিক্ষক-শিল্পীকে এ সন্ধ্যায় কেন ডেকেছেন?

'আচ্ছা, আপনি রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখতে চান। এ বিষয়ে তালিম কার কাছে—যদি বলেন...

একটু আমতা আমতা করে তার উত্তর, 'কিংশুক ব্যানার্জীর কাছে গান শিখতে যেতাম।

আবার আশ্চর্য হবার পালা। শান্তিনিকেতন ঘরাণার ধারক-

বাহক কিংশুক ব্যানার্জীর কাছে শিখলে আবার কারও কাছে তালিম নিতে হয়? পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে মনে হচ্ছে। এবার ৩ মাস পরে তাকে চিঠিদেবার কারণ জানতে হবে।

'আপনি বিজ্ঞাপন দেবার তিনমাস পর আমাকে চিঠি পাঠালেন —কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

'এই তিনমাস তিনজনকে তালিম দেবার জন্য রেখেছিলাম। তাই··· দীপংকরের অনুমান মিলে যাচ্ছে। রুপালীর এ মহিলার সম্পর্কে গান নিয়ে খেলা করার মন্তব্য ঠিকই। তার ধারণা, এদের তালিম দিতে গেলে সম্মান স্বাধীনতা খর্ব হবে। দু দিন ক'রে শেখালে সে হয়তো ২৫০ কি ৩০০ পাবে। সেটাই কি সব? আগের ২/৩ জন শিক্ষক নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করেছেন। তাই, সে মোটেই সে পথে যাবে না। দু তিনটে কথা তার আরও জিজ্ঞাস্য আছে।

'তাই এবার আমাকে দেখা করতে বলেছেন! সৌরভী দত্ত, কিংশুক ব্যানার্জীর মতো বিখ্যাত শিল্পীদের কাছে শিখে আপনি আমাদের মতো সামান্য পরিচিত শিক্ষকদের কাছে শিখতে চান কেন?

'আমার কথামতো, পছন্দের গান তাদের তুলিয়ে দিতে হবে। টাকাটা আমি কম দেব না।

'দেখুন, মিসেস দে, গানটা মেয়েদের দশ হাতি শাড়ি নয় যে পছন্দ হলো পরলেন, না-পসন্দ তো ছেড়ে ফেলে দিলেন। অনেক রেওয়াজ করে আমরা গান বাজনা শিখেছি। যাবার আগে দুটো কথা বলবো। 'শ্রদ্ধাবান লড়তে জ্ঞানম্' কথাটা মানেন তো? গুরু আচার্যদের সম্মান রাখুন। তবে রাখুন। তবেই নিজে কিছু জানবেন, গাইতে পারবেন। মতো মহান স্রষ্টার সমালোচনা করলেন—ও সব করে শিরোনামে আসা যাবে না। আসছি, নমস্কার।

দীপংকর ব্রিফ-কেসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরালো।

কবি নির্মলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

নাগরী

কাশ কলাবতী নেই
এইখানে নেই কোন সবুজের বিস্তার
পোড়ামাটি কংক্রীট
সভ্যতা নোনা ইঁট থেকে নেই নিস্তার।

খাল বিল গাঙ্‌চিল
গ্রাম হাসি অনাবিল নেই সহজের আশ
মানবিক সাহারায়
উন্মন মহড়ায় কলকাতা করে বাস।

শহরের এই দেশ
উদ্দাম আছে বেশ রস কষ ছাড়া
সমাজ এগিয়ে চলে
পণ্ডিতেরা কথা বলে ইতিহাস ন্যাড়া।

মোহনা সঙ্গীন

বিবেক বন্ধক দিয়ে কিনেছ আকাশ
অসম্পন্ন খেলা থাকে বেশুখা চাতালে
চেতনার ঘোলাজল পুরীষ সুরভি
তোমাদের নামান্তরে বিপ্লব কেতন (নওরঙ খেলা)
শান্তি তৃপ্তি ফ্রীজ হয় বস্তুপ্রেম দহে
উঞ্ছপ্রেম জল ঢালে, মরা খাদ কাটে
সিঞ্জনী রূপটিরে ধরে নদীমোহনায়
সাগর সন্ধান করে' কুঁয়োয় পেঁছায়।

শেষ রাত্রির লগ্ন মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

তখনো জাগেনি ভোরের পাখিরা
আমি কবিতায় মগ্ন,
শেষ রাত্রির আলসেমি মাখা
ঘুম ঘুম এক লগ্ন।

লেখার টেবিলে বসে বসে আমি
ছন্দের জাল বুনছি,
দূরে থেকে আসা নিশাচর কিছু
পাখির কাকলি শুনছি।

এমনি সময় তোমাকেই শুধু
ভেবে ভেবে হই ক্লান্ত,
যা-ই লিখে যাই হয় না কিছুই
হয়ে যায় সব ম্লান ত।

দরোজাটা খুলে বাইরে বেরোই
লাগেনা তখন মন্দ
বাতাসে বেড়ায় বকুল ফুলের
মন আকুলের গন্ধ।

দূর আকাশের সীমাহীন বুকে
শুকতারা শুধু জ্বলছে,
মায়াবী শীতল বাতাসের সাথে
কতো কথা যেন বলছে।

রাত্রি ফুরায় কবিতা লেখার
হয় না তবুও শেষ যে,
দেহ মন জুড়ে রয়ে যায় শুধু
রাত জাগানিয়া রেশ যে।

উর্মী সেনগুপ্তের (বয়স ১১) তিনটি ছড়া

পুজোর আওয়াজ

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডেডাং ড্যাং বাজছে পুজোর ঢাক
পুঁ-পুঁ-পুঁ-পুঁ-করে বাজছে পুজোর শাঁখ।
একদল মেয়ে হাসতে হাসতে ভরজে পুজোর ঘটি
ও পারেতে চ্যাংড়া ছেলে দিচ্ছে দেখ সিটি।
বাচ্চাগুলি নেহাৎ ছোট কাঁদছে ভেউ ভেউ
কুকুরগুলো গলা মিলিয়ে ডাকছে ঘেউ ঘেউ।
মা দেখছেন এত কান্ড করছে মর্তবাসী
থাকতে তিনি পারলেন না, না দিয়ে মুচকি হাসি।

গ্রাম

এক যে ছিল গ্রাম ভাগিরথী তার নাম
সেই গ্রামেতে থাকতো যারা বড়ই গরীব ছিল তারা
সবাই সবার সঙ্গে তারা করতো মেলামেশা
চাষ-আবাদ আর মজুরখাটা এটাই তাদের পেশা
তবু সেই গ্রামের মানুষ ছিল বড়ই খাসা।

বিয়েবাড়ি

ঐ যে দূরে বিয়ে বাড়ি বর আনতে সাজছে গাড়ি
যাচ্ছে মানুষ খাচ্ছে লোক ছোট খুকুর ঘুরছে চোখ
খুব সেজেছে কর্তাগিন্নি এসেছে ফুলের গোছা কিনি
বউটি বসে একা একা সাজছে যেন কতই ন্যাকা
অনেক কিছু গয়না-গাঁটি দিয়ে
বাপের মেয়ে আর মায়ের ছেলে হয়ে গেল বিয়ে।

মহিয়সী রাক্ষসী হরিভট্ট

নব জাতক সে শিশু উদয়কে
পান্নার হাতে দিয়া,
রানীর মৃত্যু, প্রসবের পরে
গভীর চিন্তা নিয়া।
শুধু মরণ সময় আশ্বাস তাঁর—
ধাত্রী পান্নার কাছে,
জঠরে না ধরি কন্যা সমান
যারে তিনি পালিয়াছে।
তাই মরণের কাছে, তার হাত ধরে,
সাশ্রু নয়নে কয়,
এসেছো পান্না, ঋণ শুধিবার,
এই তব সুসময়।
আমি চলে গেলে দুধের শিশুকে
তুমিই পালিও তারে,
কোনো দুর্জ্জন, কভু যেন তাকে,
কিছু না করিতে পারে।
তুমিও তো এক পুত্রের মাতা,
স্তন দুগ্ধের ভার,
দয়া করে দিও মম পুত্রকে
শুধু এক ভাগ তার।
অশ্রু-সজল-নয়নে পান্না
সম্মতি দিল তায়,
শান্তিতে রানী চক্ষু মুদিয়া
পরলোকে চলে যায়।

পান্না পালিছে দুইশিশু-যেন
কৃষ্ণ ও বলরাম,
দিনে দিনে দোঁহে বড় হোল তারা
'উদয়' 'অস্ত' নাম।
বুকেতে জড়ায়ে দুই শিশু ভালে
এঁকে দিয়ে চুম্বন,
সুধালো তাদের বলতো তোমরা
ধন্য কি সে জীবন ?
বুক ফুলাইয়া 'অস্ত' কহিল
এ প্রশ্ন কেন মাতা ?
আত্ম-হনন পরার্থে যার,
সেই তো পরিত্রাতা।
গর্ব্বে ভরিল, পান্নার বুক
'অস্তকে' টেনে বুকে,
কপোল্ চাপিয়া ধরিয়া তাহারে
চুম্বন দিল মুখে।
প্রমাদ গনিল শুনি একদিন
দূত মুখে বিবরণ,
পিতাকে মারিয়া দাসীর পুত্র,
বসেছে সিংহাসন।
বনবীর আজ রাত্রে আসিবে
উদয়'কে বধিবারে,
নিষ্কণ্টক হইতে সে চায়
বধিয়া যে দাবীদারে।
অশ্রু শুকালো নয়নে পান্না
কঠিন করিল হৃদি,
ডালি দিবে আজ নিজে শিশুরে
তাহারই নয়ন নিধি।

'উদয়' 'অস্ত' ঘুমায় দোঁহে যে
মায়ের কাছেতে হায় !
'উদয়ের' সাজে সাজালো 'অস্তে'
শোয়াইল বিছানায়।
'অস্তের' বেশ 'উদয়ের' গায়ে
পরাইয়া দিয়া তাকে,
বাহিরে পাঠালো ভৃত্যকে দিয়া
রাজার বংশটাকে।
হেন কালে সেথা যমদূত সম
বনবীর এসে কয়,
কোথায় তোমার পলিত পুত্র
কোথায় সেই 'উদয়' ?
হস্ত প্রসারিত দেখালো পান্না—
নিজের পুত্র প্রতি,
যেন কঠিন-হৃদয়া রাক্ষসী এক
ছন্ন হয়েছে মতি।
উন্মুক্ত সে কৃপাণ আঘাতে,
মুণ্ড ছেদন্ করি।
চলে গেলো হায় দাসীর পুত্র
মুখে অট্টহাস্য ধরি।
এতক্ষণেতে কাঁদিল পাষাণী
মৃতদেহ জড়াইয়া,
(বলে) আমিও যাইব তোর সাথে আজ
থাকি তোর কাছে গিয়া।
নিজের ছুরিকা বক্ষে হানিয়া
মরে মহিয়সী পান্না,
হাসিতে হাসিতে চলে গেলো সে যে
"রেখে গেলো শুধু কান্না।"

মিলন দেবকুমার গুহ

দিতেছ তুমি ছড়ায়ে আকাশে তোমার আশিস্ কণা
সেই কণা তুলে লইনু আমি পরম তীর্থ জনা,
জনে জনে তুমি বিরাজ করিছ মিলন ক্ষণস্থায়ী
সেই স্থায়ী যেন বয়ে বয়ে হই যে চিরস্থায়ী।
এ মোর বাসনা হবে না পূরণ তোমার ইচ্ছা বিনা
ভগবান মাঝে ভক্তবাঞ্ছা চরম পরমাধীনা,
পুলক তোমার কণার বিন্দু একটি নিয়ম ধ্যান
অপার নিয়মে চরম পুলক বস্তুনিষ্ঠা জ্ঞান।
দয়ার আধার, আঁধার পথেতে জ্বালো গো পরম জ্যোতি
সেই জ্যোতি মোর দিব্য চেতনা অপরূপা এক মতি,
তুমি আর আমি পায়ে পায়ে হাঁটি ধরি যে সরল রেখা
অন্তহীনের চলার পথেতে পাইনা তোমার দেখা ॥

সুন্দরের আলেয়ায় স্বপতি ঘোষাল

আমি আজ ভুলে গেছি
ভুলে গেছি, জীবনের যতসব যন্ত্রণা।
ভুলে ভরা আমার এ
অবোধ মনে পেয়েছি যে বিবেকের মন্ত্রণা!
ব্যর্থতার ধোঁয়াশায়
জীবনের ভালমন্দ যেন আজ মরীচিকা!
এই সৃষ্টির সুদামায়
কত যে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর বিভীষিকা!
আকাশের দিকে দিকে
মহাবিশ্ব জুড়ে জ্বলে যে নয়ন তারা!
সুন্দরের আলেয়ায়
অনন্তের অভিযানে আমি যে চেতনাহারা।

তোমার, আমার সনৎকুমার মিত্র

চাঁদ কী?
প্রতিবিম্বিত রূপে যাকে হারানো যায় না।
রূপ কী?
সে তোমার হৃদয়ের ঈপ্সিত আয়না।
হৃদয় কী?
সে তোমার সীমাহীন প্রেমের আধার।
প্রেম কী?
সেই সব। আদি অন্ত তোমার, আমার।

কবি শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখে

ভাগ্যিস তুমি ছিলে, তাই... মৃণাল ঘোষ

আজ থেকে বছর কয়েক আগে,
শুনেছিলাম তোমার নাম
তুমি নাকি গাহিছ আধুনিক গান ॥
মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলাম
আরে ছোঃ—
এরকম তো কত এলো
আর কত গেল ॥
কোন একদিন
'চারণ দলের' নাটকের পরে,
নাটক দেখতে গিয়ে হঠাৎ তোমায় পেলাম
সেদিনই তোমার গান প্রথম শুনলাম ॥
মুগ্ধ হলাম অবাক হলাম,
এমনি করেই তোমায় পেলাম,
নতুন জোয়ার আনলে তুমি বাংলা গানে,
সবখানেতেই ছুটে যাই তোমার টানে ॥
গানওয়ালা, পাগল, তিনি বৃদ্ধ হলেন,
সুমন আমায় একি করে গেলেন?

সমাচার ঃ এক দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

পক্ষীকুল শস্য খুটিয়া খায়। সুতরাং হাঁড়ির পিছনে
কালির উপর চুন দিয়া চোখ মুখ নাক আঁকা হইল।
ডাণ্ডার উপ ইহাকে স্থাপন করিয়া জমিতে পোঁতা হইল।
অর্থাৎ কাকতাড়ুয়া বানানো হইল।
দুই এক দিবস পক্ষীরা ইহাকে বাতাসে দুলিতে দেখিয়া
ভয়ে আসিল না। ক্ষুধা বাড়িল। তাহারা লক্ষ্য করিল
উহা স্থিরভাবে একস্থানে রহিয়াছে। তাহারা সাহস করিয়া
পুনরায় জমিতে নামিল এবং মনের আনন্দে শস্য খাইতে লাগিল।
কাকতাড়ুয়া প্রশ্ন করিল—আমাকে তোমরা মানিতেছ না কেন?
পক্ষী বলিল—'তোমার উর্দি আছে, ক্ষমতা নাই। আমাদের
ক্ষুধা আছে, খাদ্য নাই। মহারাজ যা ভাবেন ভাবুন।'

নীল আকাশের নিচে বিমলেন্দু দাস

নীল আকাশ দেখতে যেতে হবে কোনও পাহাড়িয়া দেশে
কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল নীলিম, কখনও কুয়াশার
আবরণে করে লুকোচুরি খেলা, সবুজ গাছ চারিদিকে
আছে মেলা! পাহাড়ের চূড়া যায় দেখা সাদা
কোথাও গভীর খাদ, তারি পাশে সর্পিল গতিতে
পাহাড়ের গায়ে উঠে যায় সর্পিল গতিতে শীর্ষদেশে
আঁকাবাঁকা পথ দেখা যায় নিচে, এ এক অপূর্ব
সৃষ্টি মানুষের, মৃদুছন্দে বিস্তারিত নান্দনিক দৃশ্যে
জুড়ায় মন, চোখের নেশা শহরে T. V.-র
আকর্ষণে। উত্তেজনার সৃষ্টি পচণ্ড গতিতে
বাদ্যের ও নাচের অঙ্গ ভঙ্গিমায় পরিবর্ত
মেলে। শিল্পের বিরাট আয়োজন শহরে
এলে ফিরে প্রলোভনে হাজারো
পসরা সাজায়। শহরে ফিরে এসে সামান্য
কিন্তু অবসর মাঝে কাটে সারাদিন কর্মব্যস্ততায়
কোথায় অবসর? সভ্যতা পেয়েছিল কি এই পরিচয়?

কালের ইতিহাস শান্তনু খাটুয়া

নিঃসঙ্গ বিস্বাদ জীবনে মনে হয়েছিল পৃথিবীতে বেঁচে সুখ নেই
সামনে পিছনে উপরে নীচে এক ভীষণ ক্ষয় চলছে
যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সবাই,
স্নেহ প্রেম প্রীতি বাৎসল্যে কী ভীষণ ফাটল
স্বাভাবিক জীবনছন্দে ঘটছে ছন্দপতন
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে শরীর, মন, সংসার
পরিস্থিতি আমাদের সর্বগ্রাসী সরীসৃপের মতো
গ্রাস করে ফেলছে ধীরে।
পরাজিতের শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গোলপোস্টের মতো
শুধু হেরে যাওয়া, শুধু একা হয়ে যাওয়া
বিষণ্ণতা তাড়া করে ফেরে
চেতনা আর অবচেতন সত্ত্বার সন্ধিস্থলে এসে খুঁজে পেতে চাই
জীবনের আশ্বাস, নির্ভরতা আর নিশ্চিন্ততা।
মাঝে মাঝে চারপাশ কেমন এক অসম্ভব অচেনা হয়ে যায়
বুকের ভিতর একদলা বেদনা যেন
জলের ওপর বরফ টুকরোর মতো ভাসতে থাকে।
ক্ষুধার সঙ্গে জঠরের দ্বন্দ্ব
মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের লড়াই
তবুও মৃত্যুর সব ব্যূহ ছিন্ন করে আমরা বেঁচে থাকি
জীবন যে অদম্য, জীবন যে অমৃত।

প্রেম প্রশান্তকুমার পাল

প্রেম যত ভীরু
প্রেমিকের চেয়ে তত সাহসী
তার চেয়ে বেপরোয়া আর কাউকে
এই সংসারে পাওয়া যায় না।
যারা অনুভূতি-প্রবণ মানুষ,
যারা কল্পনা করতে ভালবাসে
নতুন কিছু করার আনন্দে মেতে ওঠে
তাদের শিরায় বয় চাঁদের রক্ত।
মানুষ চাঁদে গিয়ে পা রেখেছে—
তা বলে তো স্বপ্নের চাঁদকে আমরা ছুটি দিই নি।
যে মানুষ সব জায়গায় ঘাড় গুঁজে থাকে,
হতাশায় আহত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখে
প্রেমিকের ভূমিকায় সেই মানুষই
একেবারে আলাদা নির্ভীক।
কোনও আঘাত, কোন অপমান তাকে
টলাতে ভয় পায়।
পরিস্থিতি তাকে বদলে দিলে
সেও হয়ে ওঠে অতিমানব।

অনুরাগ

সকলকে শারদীয় অভিনন্দন
জানাচ্ছে

মতামত

[অনুরাগ অষ্টম সংকলন]

একজন নামকরা সাংবাদিক আমাকে হাজির করেছিলেন 'অনুরাগ' সাহিত্য সভায়। প্রশ্ন করেছিলাম, একজন নিরীহ মহিলার কবিতা রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করলেন কেন? উত্তরে বললেন,—ওঁর কবিতার ভবিষ্যৎ আছে মনে করি বলে। ভুয়ো কমিউনিজমের উকিল ম্যাকসোয়েল সাহেবের কৃপায় অত্যাচারিতা কবি ইলা মিত্রের মত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাহিত্য উনি নিশ্চয় করবেন না। 'একটি ভাবনা' —এই ছোট্ট ১৬ লাইনের কবিতাটির তাৎপর্য কম নয়। এটি অতি আধুনিক জীবনধর্মী কবিদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। এর সুর পাঠকের কানে সদা গুঞ্জনরত ঃ

'জীবন সায়াহ্নে···সখা তুমি কি ভীত?···
ভীত নহি আমি।...
যাব না হারায়ে আমি, তুমি, সে ও সখা।
দেখা হবে পথে ঘাটে...
নতুন করিয়া দেব ভরি—মনের পাত্রটিকে।'

এর পরেও বলছি, শ্রীমতী ভট্টাচার্যের কবিতা আরও অনেক, অনেক, অনেক জোরালো। তাই বলতে ইচ্ছে করে ঃ

এই শ্রাবণের বুকের মাঝে আগুন আছে,
সেই আগুনের আলোর রূপ যে তোমার চোখে।

লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব নেই কোন সরকারি পত্রিকার অথবা ব্যবসায়ী পত্রিকার।...

—জগন্নাথ মিত্র ১০২ সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

শ্রীহরি ভট্টের 'ভারত জগৎতীর্থ' কবিতাটি পড়ে বেশ ভাল লাগল। কবিতার মাধ্যমে আমরা অনেকেই অনেক কিছু বলতে চাই। কিন্তু সঠিক ভাবে বলতে পারি না। এই দীর্ঘ কবিতায় শ্রীহরি ভট্ট আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ভারতের মনীষীদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাঁদের সত্যিকার রূপ যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে তাঁর অন্য কবিতা পাঠের আগ্রহ থাকল।

—ডাঃ নগেন নিয়োগী ১৩১ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬

আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল

সাধক-কবি আদিত্যকুমার গোস্বামী প্রভুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল' নামে একটি প্রবন্ধ ও কাব্য সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দের উপস্থিতিতে ভাষণ-আবৃত্তি-নৃত্যগীত সহ শুভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সময়ঃ সকাল দশটা, চব্বিশে নবেম্বর, রবিবার, ১৯৯৬

স্থানঃ আশুতোষ মেমোরিয়াল হল।
৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

এই অনুষ্ঠানে সবান্ধব উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

সাধক-কবি আদিত্যকুমার স্মৃতি সমিতি
১৩৫ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬

Wifh Best Wishes :

D. K. SINGH

Transport Contractor

✪

P158, Najrul Islam Avenue
Calcutta-700054

Edited and Published by Dhira Bhattacharya M. A.
from 34/2, Mahim Haldar Str. Calcutta-700026